প্রথম প্রকাশ
১৩৫১
প্রকাশক
নীলিমা দেবী
সিগনেট প্রেস
২৫/৪ একবালপুর রোড
কলকাতা ২৩
প্রচ্ছদপট
পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়
মুদ্রক দুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬

শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীকে

—বাবার আশীর্বাদ

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'মহাপৃথিবী'র কবিতাগুলো ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮-এর ভিতর রচিত হয়েছিলো। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বেরিয়েছে ১৩৪২ থেকে ১৩৫০-এ। 'বনলতা সেন' ও অন্য কয়েকটি কবিতা বার হয়েছিলো 'বনলতা সেন' বইটিতে। বাকি সব কবিতা আজ প্রথম বইয়ের ভিতর স্থান পেলো।

শ্রাবণ ১৩৫১

—জীবনানন্দ দাশ

সূচীপত্র

মহাপৃথিবী

আমিষাশী তরবার

পুনশ্চ

মহাপৃথিবী

নিরালোক

একবার নক্ষত্রের দিকে চাই—একবার প্রান্তরের দিকে
আমি অনিমিখে।
ধানের খেতের গন্ধ মুছে গেছে কবে
জীবনের থেকে যেন ; প্রান্তরের মতন নীরবে
বিচ্ছিন্ন খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার ;
নক্ষত্রেরা বাতি জ্বেলে—জ্বেলে—জ্বেলে—'নিভে গেলে – নিভে গেলে ?'
ব'লে তারে জাগায় আবার ;
জাগায় আবার।
বিক্ষত খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে—বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার,
ঘুম পায় তার।

অনেক নক্ষত্রে ভ'রে গেছে সন্ধ্যার আকাশ—এই রাতের আকাশ ;
এইখানে ফাল্গুনের ছায়ামাখা ঘাসে শুয়ে আছি ;
এখন মরণ ভালো,—শরীরে লাগিয়া রবে এই সব ঘাস ;
অনেক নক্ষত্র রবে চিরকাল যেন কাছাকাছি।

কে যেন উঠিল হেঁচে,—হামিদের মরখুটে কানা ঘোড়া বুঝি !
সারাদিন গাড়ি-টানা হ'লো ঢের,—ছুটি পেয়ে জ্যোৎস্নায় নিজ মনে
খেয়ে যায় ঘাস ;
যেন কোনো ব্যথা নাই পৃথিবীতে,—আমি কেন তবে মৃত্যু খুঁজি ?
'কেন মৃত্যু খোঁজো তুমি ?' চাপা ঠোঁটে বলে দূর কৌতুকী আকাশ।

ঝাউফলে ঘাস ভ'রে—এখানে ঝাউয়ের নিচে শুয়ে আছি ঘাসের উপরে ;
কাশ আর চোরকাঁটা ছেড়ে দিয়ে ফড়িং চলিয়া গেছে ঘরে।
সন্ধ্যার নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন পথে কোন ঘরে যাবো !
কোথায় উদ্যম নাই, কোথায় আবেগ নাই,- চিন্তা স্বপ্ন ভুলে গিয়ে
শান্তি আমি পাবো ?

রাতের নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন পথে যাবো ?

'তোমারি নিজের ঘরে চ'লে যাও'—বলিল নক্ষত্র চুপে হেসে—
'অথবা ঘাসের 'পরে শুয়ে থাকো আমার মুখের রূপ ঠায় ভালোবেসে ;
অথবা তাকায়ে গ্যাখো গোরুর গাড়িটি ধীরে চ'লে যায় অন্ধকারে
সোনালি খড়ের বোঝা বুকে ;

পিছে তার সাপের খোলশ, নালা, খলখল অন্ধকার—শান্তি তার
রয়েছে সমুখে ;
চ'লে যায় চুপে-চুপে সোনালি খড়ের বোঝা বুকে ;—
যদিও মরেছে ঢের গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, —তবু তার মৃত্যু নাই মুখে।'

সিন্ধুসারস

দু-এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি
হে সিন্ধুসারস,
মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের জানালায় নামি
নাচিতেছ টারান্‌টেলা—রহস্যের; আমি এই সমুদ্রের পারে চুপে থামি
চেয়ে দেখি বরফের মতো শাদা ডানা দুটি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীর আনন্দ জানায়।

মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে-শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান,
আবার ফুরায় রাত্রি, হতাশ্বাস; আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে; আবার তোমার গান
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহ্বান।

জানো কি অনেক যুগ চ'লে গেছে? ম'রে গেছে অনেক নৃপতি?
অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জানো না কি? অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে—হারায়েছি আনন্দের গতি;
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান?

জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,
তুমি পিছে চাহো নাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই,
বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাতে
ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
যে-রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নেই তব; নেই নিম্নভূমি—নেই আনন্দের অন্তরালে
প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

স্বপ্ন তুমি ত্যাখোনি তো—পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক ; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার—ম্লান চুল, চোখ তার হিজল বনের মতো কালো ;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো

নিভে গেছে ; যেখানে মধু ফুরায়েছে, করে না বুনন
মাছি আর ; হলুদ পাতার গন্ধে ভ'রে ওঠে অবিচল শালিকের মন,
মেঘের তুপুর ভাসে—সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন
মেঘের তুপুরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে ;
সেখানে আকাশে কেউ নেই আর, নেই আর পৃথিবীর ঘাসে।

তুমি সেই নিস্তব্ধতা চেনো নাকো ; অথবা রক্তের পথে
পৃথিবীর ধূলির ভিতরে
জানো নাকো আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে ;
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে ;
গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।

এই সব জানো নাকো প্রবালপঞ্জর ঘিরে ডানার উল্লাসে ;
রৌদ্রে ঝিলমিল করে শাদা ডানা শাদা ফেনা-শিশুদের পাশে
হেলিওট্রোপের মতো তুপুরের অসীম আকাশে !
ঝিকমিক করে রৌদ্রে বরফের মতো শাদা ডানা,
যদিও এ-পৃথিবীর স্বপ্ন চিন্তা সব তার অচেনা অজানা।

চঞ্চল শরের নীড়ে কবে তুমি—জন্ম তুমি নিয়েছিলে কবে,
বিষণ্ণ পৃথিবী ছেড়ে দলে-দলে নেমেছিলে সবে
আরব সমুদ্রে, আর চীনের সাগরে—দূর ভারতের সিন্ধুর উৎসবে ;
শীতার্ত এ-পৃথিবীর আমরণ চেষ্টা ক্লান্তি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমেছিলে কবে নীল সমুদ্রের নীড়ে।

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম অঘ্রান
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই—আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,
জানিবে না,—কোনোদিন জানিবে না ; কলরব ক'রে উড়ে যায়
শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়।

ফিরে এসো

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে,
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে ;
যেইখানে ট্রেন এসে থামে
আম নিম ঝাউয়ের জগতে
ফিরে এসো ; একদিন নীল ডিম করেছো বুনন ;
আজো তারা শিশিরে নীরব ;
পাখির ঝরনা হ'য়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব !

শ্রাবণরাত

শ্রাবণের গভীর অন্ধকার রাতে
ধীরে-ধীরে ঘুম ভেঙ্গে যায়
কোথায় দূরে বঙ্গোপসাগরের শব্দ শুনে ?

বর্ষণ অনেকক্ষণ হয় থেমে গেছে ;
যত দূর চোখ যায় কালো আকাশ
মাটির শেষ তরঙ্গকে কোলে ক'রে চুপ করে রয়েছে যেন ;
নিস্তব্ধ হ'য়ে দূর উপসাগরের ধ্বনি শুনছে।

মনে হয়
কারা যেন বড়ো-বড়ো কপাট খুলছে,
বন্ধ ক'রে ফেলেছে আবার ;
কোন দূর—নীরব—আকাশরেখার সীমানায়।

বালিশে মাথা রেখে যারা ঘুমিয়ে আছে
তারা ঘুমিয়ে থাকে ;
কাল ভোরে জাগবার জন্য।
যে-সব ধূসর হাসি, গল্প, প্রেম, মুখরেখা
পৃথিবীর পাথরে কঙ্কালে অন্ধকারে মিশেছিলো
ধীরে-ধীরে জেগে ওঠে তারা ;
পৃথিবীর অবিচলিত পঞ্জর থেকে খশিয়ে আমাকে খুঁজে বার করে

সমস্ত বঙ্গসাগরের উচ্ছ্বাস থেমে যায় যেন ;
মাইলের পর মাইল মৃত্তিকা নীরব হ'য়ে থাকে।

কে যেন বলে :
আমি যদি সেই সব কপাট স্পর্শ করতে পারতাম
তাহ'লে এই রকম গভীর নিস্তব্ধ রাতে স্পর্শ করতাম গিয়ে।—

আমার কাঁধের উপর ঝাপশা হাত রেখে ধীরে-ধীরে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে

চোখ তুলে আমি
দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো প্রবেশ করলাম :
সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম।

মুহূর্ত

আকাশে জ্যোৎস্না—বনের পথে চিতাবাঘের গায়ের ঘ্রাণ ;
হৃদয় আমার হরিণ যেন :
রাত্রির এই নীরবতার ভিতর কোন দিকে চলেছি !
রূপালি পাতার ছায়া আমার শরীরে,
কোথাও কোনো হরিণ নেই আর ;
যত দূর যাই কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
শেষ সোনালি হরিণ-শস্য কেটে নিয়েছে যেন ;
তারপর ধীরে-ধীরে ডুবে যাচ্ছে
শত-শত মৃগীদের চোখের ঘুমের অন্ধকারের ভিতর।

শহর

হৃদয়, অনেক বড়ো-বড়ো শহর দেখেছো তুমি ;
সেই সব শহরের ইটপাথর,
কথা, কাজ, আশা, নিরাশার ভয়াবহ হৃত চক্ষু
আমার মনের বিস্বাদের ভিতর পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।
কিন্তু তবুও শহরের বিপুল মেঘের কিনারে সূর্য উঠতে দেখেছি ;
বন্দরের নদীর ওপারে সূর্যকে দেখেছি
মেঘের কমলারঙের খেতের ভিতর প্রণয়ী চাষার মতো বোঝা রয়েছে তার ;
শহরের গ্যাসের আলো ও উঁচু-উঁচু মিনারের ওপরেও
দেখেছি—নক্ষত্রেরা—
অজস্র বুনো হাঁসের মতো কোন দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে উড়ে চলেছে।

শব

যেখানে রূপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শরের ভিতর,
যেখানে অনেক মশা বানায়েছে তাহাদের ঘর ;
যেখানে সোনালী মাছ খুঁটে-খুঁটে খায়
সেই সব নীল মশা মৌন আকাঙ্ক্ষায় ;
নির্জন মাছের রঙে যেইখানে হ'য়ে আছে চুপ
পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ ;
কান্তারের একপাশে যে-নদীর জল
বাবলা হোগলা কাশে শুয়ে-শুয়ে দেখিছে কেবল
বিকেলের লাল মেঘ ; নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে
পৃথিবীর অন্য নদী ; কিন্তু এই নদী
রাঙা মেঘ—হলুদ-হলুদ জ্যোৎস্না ; চেয়ে ঢ্যাখো যদি ;
অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো ;
লাল নীল মাছ মেঘ—ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে ; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন : নীল লাল রূপালি নীরব ।

স্বপ্ন

পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে আমি
নিস্তব্ধ ছিলাম ব'সে ;
শিশির পড়িতেছিল ধীরে-ধীরে খ'শে ;
নিমের শাখার থেকে একাকীতম কে পাখি নামি

উড়ে গেলো কুয়াশায়,—কুয়াশার থেকে দূর-কুয়াশায় আরো।
তাহারি পাখার হাওয়া প্রদীপ নিভায়ে গেলো বুঝি ?
অন্ধকার হাৎড়ায়ে ধীরে-ধীরে দেশলাই খুঁজি :
যখন জ্বালিব আলো কার মুখ দেখা যাবে বলিতে কি পারো ?

কার মুখ ?—আমলকী শাখার পিছনে
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ একদিন দেখেছিলো তাহা ;
এ-ধূসর পাণ্ডুলিপি একদিন দেখেছিলো, আহা,
সে-মুখ ধূসরতম আজ এই পৃথিবীর মনে।

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন :
সেই মুখ আর আমি রবো সেই স্বপ্নের ভিতরে।

বলিল অশ্বত্থ সেই

বলিল অশ্বত্থ ধীরে : 'কোন দিকে যাবে বলো—

তোমরা কোথায় যেতে চাও ?

এত দিন পাশাপাশি ছিলে, আহা, ছিলে কত কাছে ;
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো—আজো তো দাঁড়ায়ে তারা আছে ;
এই সব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন দিকে কোন পথে ফের
তোমরা যেতেছো চ'লে পাই নাকো টের !
বোচকা বেঁধেছো ঢের,—ভোলো নাই ভাঙা বাটি ফুটো ঘটিটাও ;
আবার কোথায় যেতে চাও ?

'পঞ্চাশ বছরও হায় হয়নিকো,—এই-তো সে-দিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়
—আজও, আহা, তাহাদের কথা মনে হয় !—
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে
এই দেশে এই পথে এই সব ঘাস ধান নিম জামরুলে
জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনার শুধেছিলো ঋণ ;
দাঁড়ায়ে-দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে,—মনে হয় যেন সেই দিন !

'এখানে তোমরা তবু থাকিবে না ? যাবে চ'লে তবে কোন পথে ?
সেই পথে আরো শান্তি— আরো বুঝি সাধ ?
আরো বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ ?
তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে রবে আকাঙ্ক্ষার ঘর !...
যেখানেই যাও চ'লে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর ;
এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধুসর
ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর !'
বলিল অশ্বত্থ সেই ন'ড়ে-ন'ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর।

আট বছর আগের একদিন

শোনা গেলো লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে ;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'লো তার সাধ।

বধূ শুয়ে ছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিল
কোন ভূত ? ঘুম কেন ভেঙে গেলো তার ?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার

এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি !
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার ;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো-এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো প্যাঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন ;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরন
মরণের সাথে লড়িয়াছে ;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা ;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
এই জেনে।

অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি ?
থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা এসে
বলেনি কি : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে ?
চমৎকার !—
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার !'
জানায়নি প্যাঁচা এসে এ-তুমুল গাঢ় সমাচার ?

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হলো ;—
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে—গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

শোনো
তবু এ-মৃতের গল্প ;—কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে ;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ-জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,
চোখ পালটায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার—'

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার ?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি
ক'রে দেবো কালীদহে বেনোজলে পার ;
আমরা দু'জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার !

শীতরাত

এই সব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে ;
বাইরে হয়তো শিশির ঝরছে, কিংবা পাতা,
কিংবা প্যাঁচার গান ; সেও শিশিরের মতো, হলুদ পাতার মতো।

শহর ও গ্রামের দূর মোহনায় সিংহের হুংকার শোনা যাচ্ছে—
সার্কাসের ব্যথিত সিংহের।

এদিকে কোকিল ডাকছে—পউষের মধ্য রাতে ;
কোনো-একদিন বসন্ত আসবে ব'লে ?
কোনো-একদিন বসন্ত ছিলো, তারই পিপাসিত প্রচার ?
তুমি স্থবির কোকিল নও ? কত কোকিলকে স্থবির হ'য়ে যেতে দেখেছি,
তারা কিশোর নয়,
কিশোরী নয় আর ;
কোকিলের গান ব্যবহৃত হ'য়ে গেছে।

সিংহ হুংকার ক'রে উঠছে :
সার্কাসের ব্যথিত সিংহ,
স্থবির সিংহ এক— আফিমের সিংহ—অন্ধ—অন্ধকার।

চারদিককার আবছায়া-সমুদ্রের ভিতর জীবনকে স্মরণ করতে গিয়ে
মৃত মাছের পুচ্ছের শৈবালে, অন্ধকার জলে, কুয়াশার পঞ্জরে হারিয়ে
যায় সব।
সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর
পাবে না আর
পাবে না আর।
কোকিলের গান
বিবর্ণ এঞ্জিনের মতো খ'শে-খ'শে

চুম্বক পাহাড়ে নিস্তব্ধ।
হে পৃথিবী,
হে বিপাশামদির নাগপাশ,—তুমি
পাশ ফিরে শোও,
কোনোদিন কিছু খুঁজে পাবে না আর।

আদিম দেবতারা

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল পরিহাসে
তোমাকে দিলো রূপ—কী ভয়াবহ নির্জন রূপ তোমাকে দিলো তারা ;
তোমার সংস্পর্শের মানুষদের রক্তে দিলো মাছির মতো কামনা।

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
আমাকে দিলো লিপি রচনা করবার আবেগ :
যেন আমিও আগুন বাতাস জল,
যেন তোমাকেও সৃষ্টি করছি।

তোমার মুখের রূপ যেন রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়,
নিশীথ-দেবদারু-দ্বীপ ;
কোনো দূর নির্জন নীলাভ দ্বীপ ;

স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে তবু
তুমি মাটির পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছো ;
আমি হারিয়ে যাচ্ছি সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ার ভিতর।

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
রূপের বীজ ছড়িয়ে চলে পৃথিবীতে,
ছড়িয়ে চলে স্বপ্নের বীজ।

অবাক হ'য়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি ?
রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
পৃথিবীর সেই মানুষের রূপ ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হ'য়ে
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো-হো ক'রে হেসে উঠলো :
'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হ'য়ে শুয়োরের মাংস হ'য়ে যায় ?'

হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম আমি!—
চারদিককার অট্টহাসির ভিতর একটা বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে
অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হ'য়ে উঠলো যেন;
পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো,
যেখানেই যাই আমি সেই সব সমুদ্রের উল্কায়-উল্কায়
কেমন স্বাভাবিক, কী স্বাভাবিক!

স্থবির-যৌবন

তারপর একদিন উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত এসে
কহিবে : তোমারে চাই—তোমারেই, নারী ;
এই সব সোনা রূপা মশলিন যুবাদের ছাড়ি
চ'লে যেতে হবে দূর-আবিষ্কারে ভেসে।

বলিলাম ;—শুনিল সে : 'তুমি তবু মৃত্যুর দূত নও—তুমি—'
'নগর-বন্দর ঢের খুঁজিয়াছি আমি ;
তারপর তোমার এ-জানালায় থামি
ধোঁয়া সব ;—তুমি যেন মরীচিকা—আমি মরুভূমি—'

শীতের বাতাস নাকে চ'লে গেলো জানালার দিকে,
পড়িল আশেক শাল বুক থেকে খ'শে ;
সুন্দর জন্তুর মতো তার দেহকোষে
রক্ত শুধু ? দেহ শুধু ? শুধু হরিণীকে

বাঘের বিক্ষোভ নিয়ে নদীর কিনারে—নিম্নে—রাতে ?
তবে তুমি ফিরে যাও ধোঁয়ায় আবার ;
উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত বিবর্ণ এবার—
বরং নারীকে ছেড়ে কঙ্কালের হাতে

তোমারে তুলিয়া লবে কুয়াশা-ঘোড়ায়।
তুমি এই পৃথিবীর অনাদি স্থবির ;—
সোনালি মাছের মতো তবু করে ভিড়
নীল শৈবালের নিচে জলের মায়ায়

প্রেম—স্বপ্ন—পৃথিবীর স্বপ্ন, প্রেম তোমার হৃদয়ে।
হে স্থবির, কী চাও বলো তো—
শাদা ডানা কোনো-এক সারসের মতো ?

হয়তো সে মাংস নয়—এই নারী ; তবু মৃত্যু পড়ে নাই আজো তার মোহে।

তাহার ধূসর ঘোড়া চরিতেছে নদীর কিনারে
কোনো-এক বিকেলের জাফরান দেশে।
কোকিল কুকুর জ্যোৎস্না ধুলো হ'য়ে গেছে কত ভেসে।
মরণের হাত ধ'রে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে ?

আজকের এক মুহূর্ত

হে মৃত্যু,
তুমি আমাকে ছেড়ে চলছো ব'লে আমি খুব গভীর খুশি ?
কিন্তু আরো-খানিকটা চেয়েছিলাম :
চারিদিকে তুমি হাড়ের পাহাড় বানিয়ে রেখেছো ;—
যে ঘোড়ায় চ'ড়ে আমি
অতীত-ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাবো
এইখানে মৃতবৎসা, মাতাল, ভিখারি ও কুকুরদের ভিড়ে
কোথায় তাকে রেখে দিলে তুমি ?

এত দিন ব'সে পুরোনো বীজগণিতের শেষ পাতা শেষ করতে-না-করতেই
সমস্ত মিথ্যা প্রমাণিত হ'য়ে গেলো ;
কোন-এক গভীর নতুন বীজগণিত যেন
পরিহাসের চোখ নিয়ে অপেক্ষা করছে ;—
আবার মিথ্যা প্রমাণিত হবে ব'লে ?
সে-ই শেষ সত্য ব'লে ?
জীবন : ভারতের, চীনের, আফ্রিকার নদীপাহাড়ে বিচরণের
মূঢ় আনন্দ নয় আর
বরং নির্ভীক বীরদের রচিত পৃথিবীর ছিদ্রে-ছিদ্রে
ইস্ক্রুপের মতো আটকে থাকবার শৌর্য ও আমোদ :
তারপর চুম্বক পাহাড়ে গিয়ে নিস্তব্ধ হবার মতো আস্বাদ ?

জীবন : নির্ভীক নারীদের সৌন্দর্যের আঘাতে
নিগ্রো সংগীতের বেদনার ধুলোরাশি ?
কিন্তু এ-বেদনা আত্মিক, তাই ঝাপশা ;—একাকী : তাই কিছু নয় ;—
কিন্তু তিলে-তিলে আটকে থাকবার বেদনা :
পৃথিবীর সমস্ত কুকুর ফুটপাথে বোধ করছে আজ।

যেন এত দিনের বীজগণিত কিছু নয়,
যেন নতুন বীজগণিত নিয়ে এসেছে আকাশ।

বাংলার পাড়াগাঁয়ে শীতের জ্যোৎস্নায় আমি কত বার দেখলাম
কত বালিকাকে নিয়ে গেলো বাঘ – জঙ্গলের অন্ধকারে;
কত বার হটেনটট-জুলু দম্পতির প্রেমের কথাবার্তার ভিতর
আফ্রিকার সিংহকে লাফিয়ে পড়তে দেখলাম;

কিন্তু সেই সব মূঢ়তার দিন নেই আর সিংহদের;
নীলিমার থেকে সমুদ্রের থেকে উঠে এসে
পরিস্ফুট রোদের ভিতর
উজ্জ্বল দেহ অদৃশ্য রাখে তারা;
শাদা, হলদে, লাল, কালো মানুষদের
আর-কোনো শেষ বক্তব্য আছে কি না জিজ্ঞাসা করে।

যে-ঘোড়ায় চ'ড়ে আমরা অতীত-ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাবো
সেই সব শাদা-শাদা ঘোড়ার ভিড়
যেন কোন জ্যোৎস্নার নদীকে ঘিরে
নিস্তব্ধ হ'য়ে অপেক্ষা করছে কোথাও;

আমার হৃদয়ের ভিতর
সেই সুপক্ক রাত্রির গন্ধ পাই আমি।

ফুটপাথে

অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে ;
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো
এই-যে ট্র্যামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
অনুভব ক'রে হাঁটছি আমি।
গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে—কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;
কোন দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা মনে পড়ে আমার,—
তারা কোথায় ?
তারা কি হারিয়ে গেছে ?
পায়ের তলে লিকলিকে ট্র্যামের লাইন,—মাথার ওপরে
অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।
গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;
এই ঠাণ্ডা বাতাসের মুখে এই কলকাতার শহরে এই গভীর রাতে
কোনো নীল শিরার বাসাকে কাঁপতে দেখবে না তুমি ;
জলপাইয়ের পল্লবে ঘুম ভেঙে গেলো ব'লে কোনো ঘুঘু তার
কোমল নীলাভ ভাঙা ঘুমের আস্বাদ তোমাকে জানাতে আসবে না।
হলুদ পেঁপের পাতাকে একটা আচমকা পাখি ব'লে ভুল হবে না তোমার,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হ'য়ে
উঠবে না তোমার !
প্যাঁচা তার ধূসর পাখা আমলকীর ডালে ঘষবে না এখানে,
আমলকীর শাখা থেকে নীল শিশির ঝ'রে পড়বে না,
তার স্বর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খশিয়ে আনবে না এখানে,
রাত্রিকে নীলাভতম ক'রে তুলবে না !

সবুজ ঘাসের ভিতর অসংখ্য দেয়ালি পোকা ম'রে রয়েছে
দেখতে পাবে না তুমি এখানে,
পৃথিবীকে মৃত সবুজ সুন্দর কোমল একটি দেয়ালি পোকার মতো
মনে হবে না তোমার,
জীবনকে মৃত সবুজ সুন্দর শীতল একটি দেয়ালি পোকার মতো
মনে হবে না ;
প্যাঁচার স্বর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খশিয়ে আনবে না এখানে,
শিশিরের স্বর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খশিয়ে আনবে না,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ
নিবিড় হ'য়ে উঠবে না তোমার।

প্রার্থনা

আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও : মরি নাকি মোরা মহাপৃথিবীর তরে ?
পিরামিড যারা গড়েছিলো একদিন—আর যারা ভাঙে—গড়ে ;—
মশাল যাহারা জ্বালায় যেমন জেঙ্গিস যদি হালে
দাঁড়ায় মদির ছায়ার মতন—যত অগণন মগজের কাঁচা মালে ;
যে-সব ভ্রমণ শুরু হ'লো শুধু মার্কোপোলোর কালে ;
আকাশের দিকে তাকায়ে মোরাও বুঝেছি যে-সব জ্যোতি
দেশলাইকাঠি নয় শুধু আর—কালপুরুষের গতি ;
ডিনামাইট দিয়ে পর্বত কাটা না-হ'লে কী ক'রে চলে,
আমাদের প্রভু বিরতি দিয়ো না ; লাখো-লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে
মনোবীজ দাও : পিরামিড গড়ে—পিরামিড ভাঙে গড়ে।

ইহাদেরি কানে

একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে
অনেক কবিতা লিখে চ'লে গেলো যুবকের দল ;
পৃথিবীর পথে-পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিল আধেক কথা ;—এই সব বধির নিশ্চল
সোনার পিত্তল মূর্তি : তবু, আহা, ইহাদেরি কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চ'লে গেলো যুবকের দল ;
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে।

সূর্যসাগরতীরে

সূর্যের আলো মেটায় খোরাক কার :
সেই কথা বোঝা ভার।
অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে ওদের প্রাণ
গড়িয়া উঠিল কাক্রির মতো সূর্যসাগরতীরে
কালো চামড়ার রহস্যময় ঠাশ বুনুনিটি ঘিরে।

চারিদিকে স্থির-ধূম্র-নিবিড় পিরামিড যদি থাকে—
অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে মানবপ্রাণ
সূর্যতাড়সে ভ্রূণকে যদিও করে ঢের ফলবান,—
তবুও আমরা জননী বলিব কাকে ?
গড়িয়া উঠিল মানবের দল সূর্যসাগরতীরে
কালো আত্মার রহস্যময় ভুলের বুনুনি ঘিরে।

মনোবীজ

জামিরের ঘন বন অইখানে রচেছিলো কারা ?
এইখানে লাগে নাই মানুষের হাত।
দিনের বেলায় যেই সমারূঢ় চিন্তার আঘাত
ইস্পাতের আশা গড়ে—সেই সব সমুজ্জ্বল বিবরণ ছাড়া

যেন আর নেই কিছু পৃথিবীতে : এই কথা ভেবে
যাহারা রয়েছে ঘুমে তুলোর বালিশে মাথা গুঁজে ;—
তাহারা মৃত্যুর পর জামিরের বনে জ্যোৎস্না পাবে নাকো খুঁজে ;
বধির ইস্পাত-খড়্গ তাহাদের কোলে তুলে নেবে।

সেই মুখ এখনও দিনের আলো কোলে নিয়ে করিতেছে খেলা
যেন কোনো অসংগতি নেই—সব হালভাঙা জাহাজের মতো সমন্বয়
সাগরে অনেক রৌদ্র আছে ব'লে ;—পরিব্যস্ত বন্দরের মতো মনে হয়
যেন এই পৃথিবীকে ;—যেখানে অঙ্কুশ নেই তাকে অবহেলা
করিবে সে আজো জানি ;—দিনশেষে বাদুড়ের-মতন-সঞ্চারে
তারে আমি পাবো নাকো ;—এই রাতে পেয়ারার ছায়ার ভিতরে
তারে নয়—স্নিগ্ধ সব ধানগন্ধী প্যাঁচাদের প্রেম মনে পড়ে।
মৃত্যু এক শান্ত খেত—সেইখানে পাবো নাকো তারে।

পৃথিবীর অলিগলি বেয়ে আমি কত দিন চলিলাম।
ঘুমালাম অন্ধকারে যখন বালিশে
নোনা ধরে নাকো যেই দেয়ালের
ধূসর পালিশে
চন্দ্রমল্লিকার বন দেখিলাম
রহিয়াছে জ্যোৎস্নায় মিশে।

যেই সব বালিহাঁস ম'রে গেছে পৃথিবীতে
শিকারির গুলির আঘাতে :
বিবর্ণ গম্বুজে এসে জড়ো হয়
আকাশের চেয়ে বড়ো রাতে ;
প্রেমের খাবার নিয়ে ডাকিলাম তারে আমি
তবুও সে নামিল না হাতে।

পৃথিবীর বেদনার মতো ম্লান দাঁড়ালাম :
হাতে মৃত সূর্যের শিখা ;
প্রেমের খাবার হাতে ডাকিলাম ;
অঘ্রানের মাঠের মৃত্তিকা
হ'য়ে গেলো ;
নাই জ্যোৎস্না— নাই কো মল্লিকা।

সেই সব পাখি আর ফুল :
পৃথিবীর সেই সব মধ্যস্থতা
আমার ও সৌন্দর্যের শরীরের সাথে
ম্যমির মতনও আজ কোনোদিকে নেই আর ;
সেই সব শীর্ণ দীর্ঘ মোমবাতি ফুরায়েছে
আছে শুধু চিন্তার আভার ব্যবহার।
সন্ধ্যা না-আসিতে তাই
হৃদয় প্রবেশ করে প্যাগোডার ছায়ার ভিতরে
অনেক ধূসর বই নিয়ে।

চেয়ে দেখি কোনো-এক আননের গভীর উদয় :
সে-আনন পৃথিবীর নয়।
দু-চোখ নিমীল তার কিসের সন্ধানে ?
'সোনা—নারী—তিশি—আর ধানে'—

বলিল সে : 'কেবল মাটির জন্ম হয়।'
বলিলাম : 'তুমিও তো পৃথিবীর নারী,
কেমন কুৎসিত যেন,—প্যাগোডার অন্ধকার ছাড়ি
শাদা মেঘ-খরশান বাহিরে নদীর পারে দাঁড়াবে কি ?'

'শানিত নির্জন নদী'—বলিল সে—'তোমারি হৃদয়,
যদিও তা পৃথিবীর নারী - নদী নয়
তোমারি চোখের স্বাদে ফুল আর পাতা
জাগে না কি ? তোমারি পায়ের নিচে মাথা
রাখে না কি ? বিশুষ্ক—ধূসর—
ক্রমে-ক্রমে মৃত্তিকার কৃমিদের স্তর
যেন তারা ;—অপ্সরা—উর্বশী
তোমার আকৃষ্ট মেঘে ছিলো না কি বসি ?
ডাইনির মাংসের মতন
আজ তার জঙ্ঘা আর স্তন
বাদুড়ের খাদ্যের মতন
একদিন হ'য়ে যাবে ;
যে-সব মাছিরা কালো মাংস খায়—তারে ছিঁড়ে খাবে।'

কান্তারের পথে যেন সৌন্দর্যের ভূতের মতন
তাহারে চকিত আমি করিলাম ;—রোমাঞ্চিত হ'য়ে তার মন
ব'লে গেলো : 'তক্ষিত সৌন্দর্য সব পৃথিবীর
উপনীত জাহাজের মাস্তুলের সুদীর্ঘ শরীর
নিয়ে আসে একদিন, হে হৃদয়,—একদিন
দার্শনিকও হিম হয়—প্রণয়ের সাম্রাজ্ঞীরা হবে না মলিন ?'

কল্পনার অবিনাশ মহনীয় উদ্‌গিরণ থেকে
আসিল সে হৃদয়ের। হাতে হাত রেখে
বলিল সে। মনে হ'লো পাণ্ডুলিপি মোমের পিছনে
রয়েছে সে। একদিন সমুদ্রের কালো আলোড়নে
উপনিষদেরও শাদা পাতাগুলো ক্রমে ডুবে যাবে ;
ল্যাম্পের আলো হাতে সেদিন দাঁড়াবে
অনেক মেধাবী মুখ স্বপনের বন্দরের তীরে,
যদিও পৃথিবী আজ সৌন্দর্যেরে ফেলিতেছে ছিঁড়ে।

প্রেম কি জাগায় সূর্যকে আজ ভোরে ?
হয়তো জ্বালায়ে গিয়েছে অনেক—অনেক বিগত কাল,
বায়ুর ঘোড়ার খুরে যে পরায় অগ্নির মতো নাল
জানে না সে কিছু,—তবু তারে জেনে সূর্য আজিকে জ্বলে।
চীনের প্রাচীর ভেঙে যেতে-যেতে—
চীনের প্রাচীর বলে :
অনেক নবীন সূর্য দেখেছি রাতকানা যেন নীল আকাশের তলে ;
পুরোনো শিশির আচার পাকায় আলাপী জিভের তরে ;
যা-কিছু নিভৃত—ধূসর—মেধাবী—তাহারে রক্ষা করে ;
পাথরের চেয়ে প্রাচীন ইচ্ছা মানুষের মনে গড়ে।
অথবা চীনের প্রাচীরের ভুল—চেনেনি নিজের হাল ;
কিংবা জ্বালায়ে গিয়েছে হয়তো অনেক বিগত কাল ;
অগ্নিঘোড়ার খুরে যে পরায় জলের মতন নাল
জানে না সে কিছু···তবু তারে জেনে সূর্য আজিকে জ্বলে ;—
ববিনে জড়ানো মিশরের ম্যমি কালো বিড়ালকে বলে।

পরিচায়ক

মাঝে-মাঝে মনে হয় এ-জীবন হংসীর মতন—
হয়তো-বা কোনো-এক কৃপণের ঘরে ;
প্রভাতে সোনার ডিম রেখে যায় খড়ের ভিতরে ;
পরিচিত বিস্ময়ের অনুভবে ক্রমে-ক্রমে দৃঢ় হয় গৃহস্থের মন।
তাই সে হংসীরে আর চায় নাকো দুপুরে নদীর ঢালু জলে
নিজেকে বিস্মিত ক'রে ;—ক্রমে দূরে—দূরে
হয়তো-বা মিশে যাবে অশিষ্ট মুকুরে :
ছবির বইয়ের দেশে চিরকাল—ক্রুর মায়াবীর জাদুবলে।

তবুও হংসীই আভা ;—হয়তো-বা পতঞ্জলি জানে।
সোনায়-নিটোল-করা ডিম তার বিমর্ষ প্রসব।
দুপুরে সূর্যের পানে বজ্রের মতন কলরব
কণ্ঠে তুলে ভেসে যায় অমেয় জলের অভিযানে।
কেয়াফুলস্নিগ্ধ হাওয়া স্থির তুলাদণ্ড প্রদক্ষিণ
ক'রে যায় ;—লোকসমাগমহীন, হিম কান্তারের পার
করে নাকো ভীতি আর মরণের অর্থ প্রত্যাহার :
তবুও হংসীর পাখা তুষারের কোলাহলে আঁধারে উড্ডীন।

তবুও হংসীর প্রিয় অলোকসামান্য স্বর, শূন্যতার থেকে আমি ফেঁশে
এইখানে প্রান্তরের অন্ধকারে দাঁড়ায়েছি এসে ;
মধ্য নিশীথের এই আসন্ন তারকাদের সঙ্গ ভালোবেসে।

মরখুটে ঘোড়া ওই ঘাস খায়,—ঘাড়ে তার ঘায়ের উপরে
ঝিনঝিনে ডাঁশগুলো শিশিরের মতো শব্দ করে।
এই স্থান, হ্রদ আর, বরফের মতো শাদা ঘোড়াদের তরে

ছিলো তবু একদিন ? রবে তবু একদিন ? হে কালপুরুষ,
ধ্রুব, স্বাতী, শতভিষা,
উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহের মতো যারা তাহাদের দিশা
স্থির করে কর্ণধার ?—ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা।

ভূপৃষ্ঠের অই দিকে—জানি আমি—আবার নতুন ব্যাবিলন
উঠেছে অনেক দূর ;—শোনা যায় কর্নিশে সিংহের গর্জন।
হয়তো-বা ধুলোসাৎ হ'য়ে গেছে এত রাতে ময়ূরবাহন।

এই দিকে বিকলাঙ্গ নদীটির থেকে পাঁচ-সাত ধনু দূরে
মানুষ এখনও নীল, আদিম সাপুড়ে :
রক্ত আর মৃত্যু ছাড়া কিছু পায় নাকো তারা খনিজ, অমূল্য মাটি খুঁড়ে

এই সব শেষ হ'য়ে যাবে তবু একদিন ;—হয়তো-বা ক্রান্ত ইতিহাস
শানিত সাপের মতো অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস।
ক্রমে এক নিস্তব্ধতা : নীলাভ ঘাসের ফুলে সৃষ্টির বিন্যাস

আমাদের হৃদয়কে ক্রমেই নীরব হ'তে বলে।
যে-টেবিল শেষরাতে দোভাষীর—মাঝরাতে রাষ্ট্রভাষাভাষীর দখলে
সেই সব বহু ভাষা শিখে তবু তারকার সন্তপ্ত অনলে

হাতের আয়ুর রেখা আমাদের জ্বলে আজো ভৌতিক মুখের মতন ;
মাথার সকল চুল হ'য়ে যায় ধূসর—ধূসরতম শণ ;
লোষ্ট্র, আমি, জীব আর নক্ষত্রের অনাদি বিবর্ণ বিবরণ

বিদূষক বামনের মতো হেসে একবার চায় শুধু হৃদয় জুড়াতে।
ফুরফুরে আগুনের থান তবু কাঁচিছাঁটা জামার মতন মুক্ত হাতে
তাহার নগ্নতা ঘিরে জ্ব'লে যায়—সে কোথাও পারে না দাঁড়াতে।

নীলিমাকে যতদূর শান্ত নির্মল মনে হয়
হয়তো-বা সে-রকম নেই তার মহানুভবতা।
মানুষ বিশেষ-কিছু চায় এই পৃথিবীতে এসে
অতীব গরিমাভরে ব'লে যায় কথা ;

যেন কোনো ইন্দ্রধনু পেয়ে গেলে খুশি হ'তো মন।
পৃথিবীর ছোটো-বড়ো দিনের ভিতর দিয়ে অবিরাম চ'লে
অনেক মুহূর্ত আমি এ-রকম মনোভাব করেছি পোষণ।

দেখেছি সে-সব দিনে নরকের আগুনের মতো অহরহ রক্তপাত ;
সে-আগুন নিভে গেলে সে-রকম মহৎ আঁধার,
সে-আঁধারে দুহিতারা গেয়ে যায় নীলিমার গান ;
উঠে আসে প্রভাতের গোধূলির রক্তচ্ছটা-রঞ্জিত ভাড়।

সে-আলোকে অরণ্যের সিংহকে ফিকে মরুভূমি মনে হয় ;
মধ্য সমুদ্রের রোল—মনে হয়—দয়াপরবশ ;
এরাও মহৎ—তবু মানুষের মহাপ্রতিভার মতো নয়।

আজ এই শতাব্দীতে পুনরায় সেই সব ভাস্বর আগুন
কাজ ক'রে যায় যদি মানুষ ও মনীষী ও বৈহাসিক নিয়ে—
সময়ের ইশারায় অগণন ছায়া-সৈনিকেরা
আগুনের দেয়ালকে প্রতিষ্ঠিত করে যদি উনুনের অতলে দাঁড়িয়ে,

দেয়ালের 'পরে যদি বানর, শেয়াল, শনি, শকুনের ছায়ার জীবন
জীবনকে টিটকারি দিয়ে যায় আগুনের রঙ আরো বিভাসিত হ'লে—
গর্ভাঙ্কে ও অঙ্কে কান কেটে-কেটে নাটকের হয় তবু শ্রুতিবিশোধন।

বীভৎস কোরাস

এক

আমাদের হৃদয়ের নদীর উপর দিয়ে ধীরে
এখনো যেতেছে চ'লে কয়েকটি শাদা রাজহাঁস ;
সহধর্মিণীর সাথে ঢের দিন—আরো ঢের দিন
করেছি শান্তিতে বসবাস ;

দেখেছি সন্তানদের ময়দানে আলোর ভিতরে
স্বতই ছড়ায়ে আছে—যেমন শুনেছি টায়-টায় ;
অদ্ভুত ভিড়ের দিকে চেয়ে থেকে দেখে গেছি জনতার মাথা
গৃহদেবতাকে দেখে শৃঙ্গ শিলায় ।

নগরীর পিতামহদের ছবি দেয়ালে টাঙায়ে—
টাঙায়েছি নগরীর পিতাদের ছবি ;
পরিক্রমণে গিয়ে সর্বদাই আমাদের বড়ো নগরীতে
যাহাতে অমৃত হয় সে-রকম অর্থ, রাচক্রবী,

প্রকাশে প্রয়াস পেয়ে গেছি মনে হয় ;
আমাদের নেয় যাহা নিয়ে গেছি তুলে ;
নটে গাছ মুড়ে গেছে ব'লে মনে হয়
আমাদের বক্তব্য ফুরুলে ।

আবার সবুজ হ'য়ে জুয়ায়ে গিয়েছে
আমাদের সন্তানের—সন্তানের সন্তানের প্রয়োজনমতো ।
এ-রকম চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে কাল
সহসা খিঁচড়ে উঠে খচ্চরের মতন ফলত

অন্য-কোনো জ্যামিতিক রেখা হ'তে পারে ;
অন্য-কোনো দার্শনিক মত-বিপ্লব ;
জেনে তবু মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সংগম এড়ায়ে
স্থির হ'য়ে রবে নাকি সন্ততিরা, সন্ততির সন্ততিরা সব ?

যদি তারা টেঁশে যায় করাল কালের স্রোতে ধরা প'ড়ে গিয়ে,
যদি এই অন্ধকার প্রাসাদের ভগ্ন-অবশেষে
শেয়াল প্যাঁচার দিকে চেয়ে কেঁদে যায়,—
তখন স্বপ্নই সত্য ; গিয়েছে বস্তুর থেকে ফেঁশে

জীবনের বাস্তবতা সে-সময়।
মানুষের শেষ বংশ লোপ পেলে কে ফিরায়ে দেবে
জীবনের বাস্তবতা ?—এমন অদ্ভুত স্বপ্ন নিয়ে
মাঝে-মাঝে গিয়েছি নাগাড় কথা ভেবে।

দুই

সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ।
আমাদের সন্তানেরা একদিন জ্যেষ্ঠ হ'য়ে যাবে ;
স্বতসিদ্ধতায় গিয়ে জীবনের ভিতরে দাঁড়াবে ;
এ-রকম ভাবনার কিছু অবলেশ

তাদের হৃদয়ে আছে হয়তো-বা ;—মাঠে-ময়দানে
কথা ব'লে জীবনের বিষ তারা ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় আজ ;
অল্লায়ু হিমের দিন ততোধিক মিহিন কামিজে
কাটাতেছে যেন অগণন গিরেবাজ।

সমুদ্রের রৌদ্র থেকে আমাদের দেশে
নীলাভ ঢেউয়ের মতো দীপ্তি নেমে আসে মনে হয় ;

আমাদের পিতামহ পিতারাও প্রবাদের মতো জেনে গেছে ;
আমাদেরও ততদূর ভাববিনিময়

একদিন ছিলো,—তবু শোচনীয় কালের বিপাকে
হারায়ে ফেলেছি সেই সান্দ্র বিশ্বাস।
কারু সাথে অন্ধকার মাটিতে ঘুমায়ে,
কারু সাথে ভোরবেলা জেগে—বারো মাস

তাকেও স্মরণ ক'রে চিনে নিতে হয়
সে কি কাল ? সে জীবন ? জ্ঞাতিভ্রাতা ? গৃহিণী ?
মানুষের বংশ এসে সময়ের কিনারে থেমেছে,
একদিন চেনা ছিলো ব'লে আজ ইহাদের চিনি

অন্ধকার সংস্কার হাৎড়ায়ে, মৃতুভাবে হেসে ;
তীর্থে-তীর্থে বারবার পরীক্ষিত হ'য়ে পরিচয়
বিবর্ণ জ্ঞানের রাজ্যে কাগজের ডাঁইয়ে প'ড়ে আছে ;
আমাদের সন্ততিও আমাদের হৃদয়ের নয়।

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি
একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেছে আমাদের আগে ;
আরেকটি পৃথিবীর দাবি
স্থির ক'রে নিতে হ'লে লাগে

সকালের আকাশের মতন বয়স ;
সে-সকাল কখনো আসে না ঘোর, স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে।
পশ্চিমে অস্তের সূর্য ধূলিকণা, জীবাণুর উতরোল মহিমা রটায়ে
পৃথিবীকে রেখে যায় মানবের কাছে জনমানবের ঋণে।

তিন

সারাদিন ধানের বা কাস্তের শব্দ শোনা যায়।
ধীর পদবিক্ষেপে কৃষকেরা হাঁটে।
তাদের ছায়ার মতো শরীরের ফুঁয়ে
শতাব্দীর ঘোর কাটে-কাটে।

মাঝে-মাঝে দু-চারটে প্লেন চ'লে যায়।
একভিড় হরিয়াল পাখি
উড়ে গেলে মনে হয়, দুই পায়ে হেঁটে
কত দূর যেতে পারে মানুষ একাকী।

এ-সব ধারণা তবু মনের লঘুতা।
আকাশে রক্তিম হ'য়ে গেছে ;
কামানের থেকে নয়, আজো এইখানে
প্রকৃতি রয়েছে।

রাত্রি তার অন্ধকার ঘুমাবার পথে
আবার কুড়ায়ে পায় এক পৃথিবীর মেয়ে, ছেলে ;
মানুষ ও মনীষীর রৌদ্রের দিন
হৃদয়বিহীনভাবে শূন্য হ'য়ে গেলে।

সেই রাত্রি এসে গেছে ; সন্ততিরা জড়ায়ে গিয়েছে
জ্ঞাতকুলশীল আর অজ্ঞাত ঋণে।
পারাবত-পক্ষ-ধ্বনি সায়াহ্নের, সকালের নয়,
মাঝে এই বেহুলা ও কালরাত্রি বিনে।

চার

এখন অনেক দূরে ইতিহাস-স্বভাবের গতি চ'লে গেছে।
পশ্চিম সূর্যের দিকে শত্রু ও সুহৃদ তাকায়েছে।
কে তার পাগড়ি খুলে পুব দিকে ফসলের, সূর্যের তরে
অপেক্ষায় অন্ধকার রাত্রির ভিতরে
ডুবে যেতে চেয়েছিলো ব'লে চ'লে গেছে

আমরা সকলে তবু সময়ের একান্ত সৈকতে
নিজেদের অপরের সবায়ের জনমতামতে
অনেক ডোডোর ভিড়ে ডোডোদের মতো
নেই—তবু র'য়ে গেছি স্বভাববশত।
এই ক্রান্তি জীবন বা মরণের ব'লে মনে হয়।

আকাশের ফিকে রঙ ভোরের, কি সন্ধ্যার আঁধার ?
এই দুরত্যয় সিন্ধু কি পার হবার ?
আমরা অনেক লোক মিলে তবু এখন একাকী ;
বংশ লুপ্ত ক'রে দিয়ে শেষ অবশিষ্ট ডোডো পাখি,
হ'তে গিয়ে পারাবত-পক্ষ-ধ্বনি শুনি,
না কি ডোডোমির অতল ক্রেংকার।

প্রেম অপ্রেমের কবিতা

নিরাশার খাতে ততোধিক লোক উৎসাহ বাঁচায়ে রেখেছে ;
অগ্নিপরীক্ষার মতো কেবলি সময় এসে দ'হে ফেলে দিতেছে সে-সব
তোমার মৃত্যুর পরে আগুনের একতিল বেশি অধিকার
সিংহ মেষ কন্যা মীন করেছে প্রত্যক্ষ অনুভব।
পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি
বদলায়ে ফেলে দিয়ে তবুও পৃথিবী হ'য়ে আছে ;
অপরিচিতের মতো সমাজ সংসার শত্রু সবই
পরিচিত্ত বুনোনির মতো তবু হৃদয়ের কাছে
ক্রমশই মনে হয় নিজ সজীবতা নিয়ে চমৎকার ;
আবর্তিত হ'য়ে যায় দানবের মায়াবলে তবুও সে-সব।
তোমার মৃত্যুর পরে মনিবের একতিল বেশি অধিকার
দীর্ঘ কালকেতু তুলে বাধা দিতে চেয়েছে রাসভ।

তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলে তুমি চ'লে গেলে কবে।
সেই থেকে অন্য প্রকৃতির অনুভবে
মাঝে-মাঝে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জেগে উঠেছে হৃদয়।
না-হ'লে নিরুৎসাহিত হ'তে হয়।
জীবনের, মরণের, হেমন্তর এ-রকম আশ্চর্য নিয়ম ;
ছায়া হ'য়ে গেছো ব'লে তোমাকে এমন অসম্ভ্রম।

শত্রুর অভাব নেই, বন্ধুও বিরল নয়—যদি কেউ চায় ;
সেই নারী ঢের দিন আগে এই জীবনের থেকে চ'লে গেছে
ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে

তারপর অনুভব ক'রে গেছে রমণীর ছায়া বা শরীর
অথবা হৃদয়,—
বেরালের বিকশিত হাসির মতন রাঙা গোধূলির মেঘে ;
প্রকৃতির, প্রমাণের, জীবনের দ্বারস্থ দুঃখীর মতো নয়।

তোমার সংকল্প থেকে খ'শে গিয়ে ঢের দূরে চ'লে গেলে তুমি ;
হ'লেও-বা হ'য়ে যেতো এ-জীবন : দিনরাত্রির মতো মরুভূমি ;-
তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে, এমন স্তব্ধতা ;
জীবনেও নেই কো অন্যথা,
হেমন্তের সহোদর র'য়ে গেছে, সব উত্তেজের প্রতি উদাসীন ;
সকলের কাছ থেকে সুস্থির মনের ভাবে নিয়ে আসে ঋণ,
কাউকে দেয় না কিছু, এমনই কঠিন ;
সরল সে নয়, তবু ভয়াবহভাবে শাদা, সাধারণ কথা
জনমানুষীর কাছে ব'লে যায়—এমনই নিয়ত সফলতা।

আমিষাশী তরবার

মৃত মাংস

ডানা ভেঙে ঘুরে-ঘুরে প'ড়ে গেলো ঘাসের উপরে ;
কে তার ভেঙেছে ডানা জানে না সে ;—আকাশের ঘরে

কোনোদিন—কোনোদিন আর তার হবে না প্রবেশ ?
জানে না সে ; কোনো-এক অন্ধকার হিম নিরুদ্দেশ

ঘনায়ে এসেছে তার ? জানে না সে, আহা,
সে যে আর পাখি নয়—রঙ নয়—খেলা নয়—তাহা

জানে না সে ;—ঈর্ষা নয়—হিংসা নয়—বেদনা নিয়েছে তারে কেড়ে !
সাধ নয়—স্বপ্ন নয়—একবার দুই ডানা ঝেড়ে

বেদনারে মুছে ফেলে দিতে চায় ;— রুপালি বৃষ্টির গান, রৌদ্রের আস্বাদ
মুছে যায় শুধু তার,—মুছে যায় বেদনারে মুছিবার সাধ ।

হঠাৎ-মৃত

অজস্র বুনো হাঁস পাখা মেলে উড়ে চলেছে জ্যোৎস্নার ভিতর
কাউকে মৃত্যু ফেলে দিলো
নিচে—অন্ধকারের অচল অভ্যাসের ভিতর।

রূপসী প্রথম প্রেমের আস্বাদ পেতে যাচ্ছিলো :
শোনো—গলার ভিতরে তার মৃত্যুর গোঙরানি ;
সে নিজেও মৃত্যু যেন,
বিবেক নেই আর তার।

কবি চোখ মেলে বলেছিলো :
আমার হৃদয়ের ভিতর ইন্দ্রধনুর মতো কত বুদ্বুদ,
হিম মৃত্যু এসে চোখ অন্ধকার ক'রে ফেললো তার।

এই সব হঠাৎ-মৃত্যু
এই সব হঠাৎ-মৃত
আজ এই শীতের রাতের অরণ্যের কিনারে
বিক্ষুব্ধ বাঘের মতো গর্জন ক'রে উঠছে যেন।
গর্জন ক'রে উঠছে আমার হৃদয়ের অরণ্যে।

রূপ—প্রেম—খ্যাতি—সুপক্ক রৌদ্রের ভিতর
দাঁতের এনামেল ঝিকমিক ক'রে ওঠে
পবিত্র সমুদ্রের মতো ;—
চিরন্তন।

হায়, সোনালি বাঘ-প্রেত,
তোমাদের জন্য শুয়ারের মাংস
শুয়ারের মাংস শুধু ;
মৃত্যু তোমাদের ফেলে দিয়েছে
অন্ধকারের অচল অভ্যাসের ভিতর।

অগ্নি

আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি, হে সন্তান, প্রথম জ্বলুক তব ঘরে।
জানো না কি রাত্রি এসে ঘিরিতেছে আরো-এক দীর্ঘতর বৃত্তে রোজ
মানুষের জীবনকে।
যে-সব সৌন্দর্য র'চে গিয়েছিলো একদিন মেধাবীরা
আজ এই রজনীর অবরোধে মনে হয়
তাহাদের জ্যোতি যেন বিস্ফোরক বাষ্প হ'য়ে জ্বলে
সহসা আকাশপথে দিক্‌হস্তিদের মতো,—অদ্ভুত—অভীষ্ঠ মদকলে ;
কোনো আমলকী নাই আজ আর শিল্পীর নির্জন করতলে।

এখানে দাঁড়ায়ে থেকে মুক্ত ছবি চোখে পড়ে পৃথিবীর :
বিবর্ণ পাথর-গড়া প্রান্তরের পীঠে এক ধর্মমন্দিরের ;
আশি বছরের বুড়ো শীতের কুয়াশা ঠেলে সেই দিকে চলিয়াছে একা :
হয়তো বাজাবে ঘণ্টা, হয়তো সে সারাৎসার বিধাতাকে কাছে পাবে :
আমরা যেমন ক'রে পাই মৃত্তিকাকে, মৃত্যুকে।

পীবর মাটির মতো নিষ্কাশিত হ'য়ে যেন পৃথিবীর জরায়ুর থেকে
মাঠের কিনারে ব'সে শুষ্ক পাতা পোড়াতেছে কয়েকটি নির্মূল সন্তান ;
জরা খাদ্য চায় ; তবুও অভুক্ত পেটে তরবার হাতে নেবে
যোদ্ধার মতন নয় ; নকল সৈন্যের মত কলরবে পাঁচালির দেশে।
কৌতুকে—গোলার সব মৃত—পরাহত—ধান থেকে মেড়ে
যদি কেউ অন্যতম আলেয়ার রস এনে দিয়ে যেতো তাহাদের।
কেউ দেবে নাকো আজ এই তুণ্ডসমীচীন পৃথিবীতে।

মাথার উপর দিয়ে অনেক সন্ধ্যার কাক
প্রথম ইশারা নিয়ে উড়ে যায় আবির্ভূত গম্বুজের দিকে।
সেই পথে আমাদের যাত্রা নেই, হে সন্তান।

বৃত্তের মতন সূর্য—পশ্চিমের—
মৃত প্রলম্বিত—হাঙরের মতো—
মেঘের ওপার থেকে
প্রতিভার দীর্ঘ বাহু বাড়ায়ে দিয়েছে মেঠো হাঁসের ডানায়, শস্যহীন খেতে,
গফুরের শীর্ণ গোলাঘরে, শ্মশানে, কবরে, আমাদের সবের হৃদয়ে।
এই প্রত্যয়ের থেকে গভীর অগ্নির জন্ম হয়।

সূর্যের উদয় সহসা সমস্ত নদী
চমকিত ক'রে ফেলে—অকস্মাৎ দেখা দিয়ে—
চ'লে যায় ;—হাড়ের ভিতরে মেঘেদের
অন্ধকার ;—স্তম্ভিত বন্ধুর মতো ভোর
এইখানে সাধু রাত্রির হাত ধ'রে
তাকে শ্রেয়তর চালানির মূল জেনে
নিখিলের ;—মৃত মাংসের স্তূপ
চারিদিকে ; তার মাঝে ধন্বন্তরি, কালনেমি
কিছু চায় :
দুস্তর চাদর গায়ে অন্ধ বাতাসের।
সূর্য তবু—সূর্য যেন জ্যোতি :
প্রতিবিম্ব রেখে গেছে তরবারে—ভাঁড়ের হৃদয়ে,
ধর্মাশোকের মনে।

করজোড়ে ভাবে তারা :
ঝলিছে সারস শব ঢের
বৈতরণী তরঙ্গের দিকে ভেসে যেতে-যেতে
লোকোত্তর সূর্যের আমোদে।

সুমেরীয়

ক্রমে ধুলো উড়ে যায় বিকেলের অন্তহীন পাটল আকাশে ;
অস্ফুট বৃষ্টির গন্ধ ;—প্রকাণ্ড ময়দান জুড়ে এক পাল ভেড়া
নিরুত্তর ছবির মতন স্পষ্ট ;
সূর্যের তির্যক গতি
কৃষ্ণাভ মেঘের থেকে তাহাদের শরীরের 'পরে
সুমেরীয় বল্লমের মতো যেন প্রাগৈতিহাসিক তর্কে নড়ে।

অদ্ভুত অমল আলো একবার জ্ব'লে ওঠে চারিদিকে
সন্ধ্যা আসিবার আগে।
য়ুনানী যুগের স্তম্ভ—মাঠের বাদামি ঘাস—নদী—
ঢের মজুরের মুখ—মনে হয়—সুমেরীয়।
ইহাদের ইতিহাস শেষ হ'য়ে গেছে তবে বহু দিন!
কপিশ মাটির গর্ভ খুঁড়িলেই অখণ্ড প্রেমিক প্যারাফিন
এরা সব। অই ভৌতিক আলো চাই নাকো—আমি চাই ক্ষেম
ইহাদের অরুন্তুদ উৎস তবু সুমেরীয় প্রেম।

মৃত্যু

হাড়ের ভিতর দিয়ে যারা শীত বোধ করে
মাঘ রাতে ;—তাহারা দুপুরে ব'সে শহরের গ্রিলে
মৃত্যু অনুভব করে আরো গাঢ়—পীন।
রূপসীও মরণকে চেনে
মুকুরের অই পিঠে—পারদের মতো যেন
নিরুত্তর হ'য়ে আছে। অথবা উড্ডীন
এক-আধটি দৈত্যাকৃতি দেখা যায়
জনতারে চালাতেছে বিকালের বিরাট সভায় ;
নিদারুণ বিশ্বাসের মতো যেন স্থির ;
মৃত্যু নাই—জানে তারা ;—তবুও তাদের মুখ
চকিত আলোর পূর্ণ ফোটোগ্রাফ থেকে
উঠে এসে ভীত হয়
নিজেদের গ্লানিহীন পরিণতি দেখে।

আমিষাশী তরবার

স্মৃতিই মৃত্যুর মতো ;—ডাকিতেছে প্রতিধ্বনি গম্ভীর আহ্বানে
ভোরের ভিখিরি তাহা সূর্যের দিকে চেয়ে বোঝে।
উঁচু মঞ্চে বিধাতার পরিত্যক্ত সন্তানেরা জানে ;
পাণ্ডুলিপি, যব আর সোনার ভিতরে তারা খোঁজে

অবহিত প্রতীককে। কে দিয়েছে স্মৃতি এই বিকীর্ণ হৃদয়ে :
কোনো-কিছু অবলুপ্ত পিপাসার অন্ত্যজ ধারণা ?
বৈশালীর থেকে বায়ু জাহাজের মুখে আজো বহে ;
প্রাকৃত নাবিকাধমও মাস্তুলের পিঠ ঘেঁষে দুপুরের রৌদ্রে অন্যমনা

চেয়ে থাকে। চারিদিকে নবীন যদুর বংশ ধ্বংসে
কেবলই পড়িতে আছে ; সংগীতের নতুনত্ব সংক্রামক ধুয়া
নষ্ট ক'রে দিয়ে যায় ;—
স্মৃতির ভিতর থেকে জন্ম লয় এই সব গভীর অসূয়া।

জেনেছে বরুণ, অগ্নি, নরনারী : কর্মক্ষম জীবনের শেষে
এক পাল ভেড়া ল'য়ে হেমন্তের মাঠে
শান্তি সারাৎসার নয় ;—আলো জেলে শকুনি মামার সাথে হেসে
নগরীর রাত্রি চলে—আমিষাশী তরবার হ'য়ে তার প্রভাতকে কাটে।

তিনটি কবিতা

সন্ধিহীন, স্বাক্ষরবিহীন

কোথায় সূর্যের যেন নব-নব জন্ম ঘিরে
মরণ উড়িতে আছে শ্বেত পারাবত ;
কোথাও নক্ষত্রহীন নিরাবিল রাত্রি নিয়ে
জীবন কি বৈতরণী-তরীর নাবিক ?
পারাবত, পারাবত, তোমার হৃদয়ে শুধু রক্তবর্ণ ক্ষুধা !
যেইখানে বর্ণহীন নিস্তব্ধতা তরঙ্গের প্রাণে কোনো অঙ্কুরের সুধা
ক্ষরিবে না কোনোদিন,— সব প্রীত ভ্রমণকে শান্তি দিয়ে
চিত্ত যার শুদ্ধ অশ্রুহীনতায় সৎ,
আমাদের জীবনের নব-নব সূর্যগুলো কপোতকে দান ক'রে
আমরাও স্থির মেরু-নিশীথের নাবিকের মতন মহৎ
সততার দেখা পাবো,—সন্ধিহীন, স্বাক্ষরবিহীন।

শান্তি

জীবন কি নীরক্ত সম্রাট এক সুধাখোর ;
কূট ব্যবসায়ী নীল পার্শ্বচরগুলো তার মৃত্যুর উৎসব ?
মানুষের তরে তবে কোন পথ :
কোন অন্তরিখে তারে নিয়ে যাবে আসন্ন সময় ?
সেইখানে বালুঘড়ি, বলো, তবে স্তব্ধতার মতো :
একদিন বাতাসের সাথে ঢের ধ্বনিবিনিময়
করেছিলো ;—তারপর হ'য়ে গেছে আঁখিহীন—চুপ।
প্রান্তরের শুষ্ক ঘাসে যে-সবুজ বাতাসের আশা
একদিন বলেছিলো 'আবার করিব আমি অমৃত সঞ্চয়'—
শত-শত মেষশাবকের আঁখিতারকাও পেলো যেন ভয়।
শান্তি, শান্তি,—

উত্তেজিত শপথের উৎসারণ প্লীহা ঘিরে থাকে না সতত,
বালুঘড়ি হ'য়ে থাকে চিরদিন স্তব্ধতার মতো।

হে হৃদয়

হে হৃদয়, একদিন ছিলে তুমি নদী ;
পারাপারহীন এক মোহানায় তরণীর ভিজে কাঠ
খুঁজিতেছে অন্ধকার স্তব্ধ মহোদধি।
তোমার নির্জন পাল থেকে যদি মরণের জন্ম হয়
হে তরণী,
কোনোদূর প্রীত পৃথিবীর বুকে ফাল্গুনিক তবে
ঝরনার জল আজো ঢালুক নীরবে ;
বিশীর্ণেরা আঁজলায় ভ'রে নিক সলিলের মুক্তা আর মণি ;
অন্ধকার সাগরের মরণকে নিষ্ঠা দিয়ে,—উষালোকে
মাইক্রোফোনের মতো রবে।

১৩৩৬—৩৮ স্মরণে

অনেক চিন্তার সূত্র সমবায়ে একটি মহৎ দিন
এখানে গঠন ক'রে যেতেছিলো কয়েকটি স্থির সমীচীন
যুবা এসে ;—কোথাও বিদ্যুৎ নেই—তবুও আগুন যেন ধীরে
জ্বলেছিলো, এই হরিতকীকুঞ্জে মাঘের তিমিরে ;
ভোর এলো ;—ভারুই পাখির মতো কেউ তবু হয়নিকো আকাশে উড্ডীন !

উড়িবার কাজ সব আগন্তুক বৃহৎ চিলের তরে রেখে
অনেক আশ্চর্য শ্লোক খোঁজা হ'লো ভারতীয় মনীষার থেকে ;
যেন সব অমেয় সুদূর বৃক্ষে বাতাসের সংগীতের মতো :
আমাদের সচেতন তাড়নায় প্রাণ পেয়ে জেগেছে ফলত ;—
চোখ ক্লান্ত হয় তবু নখের ভিতরে হিম, নিরুত্তর দর্পণকে দেখে ।

তবু সেই অপার্থিব স্বর কেউ ভুলে যেতে পারে ?
দুই কানে মোম ঢেলে শুনিতে চাইনি মধ্যসমুদ্রের অন্ধকারে
আমাদের কাছে ছিলো সেদিন তা জানজিবার সমুদ্রের অই পারে—কাম ;
তাহারে এড়াতে গিয়ে করেছি অদ্ভুত প্রাণায়াম ;—
যেমন প্রবীণ তার যৌবনের প্রেম ঢেকে রাখে চোখঠারে ।

এখানে হলুদ ঘাসে—কাঁকরের রাস্তায়—নোনাধরা দেয়ালের ঘরে
হৃদয়ে গঞ্জনা এক জেগেছিলো বৃশ্চিকের মতন কামড়ে ।
এ-পৃথিবী পাক খায়,—তবু কেউ কনুয়ের 'পরে রাখে ভর
যেন স্পষ্ট সৌরজগতের এক সুশৃঙ্খল কেন্দ্রের ভিতর
রয়েছে সে ;—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন সন্ধ্যার হাঁসের মতো ফিরে আসে ঘরে ।

ঘরের হরিণ পারে অনায়াসে চ'লে যেতে গৃহস্থের গোধুম মাড়িয়ে ;
সেই পথ থেকে তবু স'রে গিয়ে অন্য-এক অহংকার নিয়ে
কয়েকটি যুবা, নারী,—সমাহৃত হ'য়ে গিয়ে ছুরির ফলায়
এখানে বাটের দিকে চেয়েছিলো ;— কার যেন স্থির মুষ্টি টের পাওয়া যায় ;

যেন সব নাশপাতি পৃষ্ঠব্রণ হয় তার নিটোল ব্লেডের মুখে গিয়ে।

আজ জানি সমবায়ে উদয়ন, নাগার্জুন, পুষ্পসেনী ছাড়া
কী রয়েছে এই সব নাম ছাড়া ?—সুনিপুণ ভাবনার ধারা
কে বুঝেছে সব নয় ?—জনতার হৃদয়ের ভীতি
মেধা নয়—সেবা চায় ;—তাই ভেঙে ধ্ব'সে গেলো অমোঘ সমিতি ;—
অন্বীক্ষার উচ্চারণে রয় কি হাঁসের ডিম মৃত্তিকায় খাড়া ?

আকাশরেখার পারে তবুও যাহারা এই পথে এসে আবার দাঁড়াবে—
প্রকম্পিত কম্পাসের সূচিমুখ খানিক স্থিরতা যেন পাবে
তাদের ছোঁয়াচে এসে ;—যদিও পাথরগুলো হ'য়ে গেছে আবার প্রাচীন
নিওলিথ পৃথিবীর ;—এই সব ঘাস, হরিতকী, সূর্য
মনে হয় যেন প্লিওসিন
হাড়গোড়ে প'ড়ে আছে নিরুত্তেজ মানুষের প্রেমের অভাবে।

ঘাস

মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেলো নদীটির পারে।
সফেন আলোক তাকে চেটে গেলো দুপুরবেলায়।
সবুজ বাতাস এসে পৃথিবীতে যাহা কোঁচকায়
তাহাকে নিটোল ক'রে নিতে গেলো নিজের সঞ্চারে।
উৎসাহে আলাপী জল তাহাকে মসৃণ
ক'রে নিতে গেলো—তবু—সময়ের ঋণ
ধীরে-ধীরে ডেকে নিয়ে গেলো তাকে কুৎসিত, কাঠ নগ্নতায়
তখন নরক তার অকৃত্রিম প্রাচীর দুয়ার
খুলে দিতে গেলো দেখে কানসোনা ঘাসের ভিতরে
সহসা লুকায়ে গেলো ঘাসের মতন তার হাড়।
সেই থেকে হাসায় এ-পৃথিবীকে ঘাস
ছ-মাস গাধাকে, আর মনীষীকে মিহি ছয়মাস।

সমীতিতে

ওইখানে বিকেলের সমিতিতে অগণন লোক।
উঠেছে বক্তা এক—ষড়যন্ত্রহীনভাবে—দেখে
দশ-বিশ বছরের আগে এক সূর্যের আলোক
সহসা দেখেছে কেউ ;—যদিও অনেকে
আশীর্বাদ করে ওর সূত্র উষ্ণ হোক ;
আরো অবারিত স্বর বার হোক মাইক্রোফোন থেকে।

আরো বিস্তারিত স্বর বার হোক—বার হয় যদি।
কেননা যুগের গালে কালি আর চুন।
আমাদের জলের গেলাশ তবু হ'তে পারে নদী ;
গোলকধাঁধার পথ—আকাশে বেলুন।
তাহ'লে বলুন এই শতাব্দীর সমাপ্তি অবধি
কী ক'রে একটি চোর সাতজন প্রেমিককে করেছিলো খুন

কোরাস

গম্ভীর নিপট মূর্তি সমুদ্রের পারে
এখনো দাঁড়ায়ে আছে।
সূর্যের আলোয় সব উদ্ভাসিত পাখি
আসে তার কাছে।
জানো না কী চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে-বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

হে চিল, চিলের গান জ্যৈষ্ঠের দুপুরে,
হে মাছি, মাছির গান,
সমুদ্রের পারে এক শব্দহীন মূর্তির বিরাম;
আর সব শাদা পাখি সূর্যের সন্তান।
জানো না কী চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে-বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

আলোর ভিতর দিয়ে হেঁটে চ'লে যাবার কৌশল
কেবলই আয়ত্ত ক'রে নিতে চায় পৃথিবীর উৎকণ্ঠিত ভিড়।
সৈকতে পাখিদের বরফের মতো শাদা ডানা
সূর্যের পাকস্থলীর।
জানো না কী চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে-বলদ তার ফলার খেয়েছে ঘানিগাছে।

কেবলই পায়ের নিচে বালির ভিতরে
উঠে আসে পারাপার-প্রত্যাখ্যাত হাড়:

কালো দস্তানায় যেন সমর্পিত, অব্যক্ত হাত—
তাদের দেখায় কিমাকার।
গম্ভীর নিপট মূর্তি সমুদ্রের পারে
এখনো দাঁড়ায়ে আছে।
সূর্যের আলোয় সব উদ্ভাসিত পাখি
আসে তার কাছে।
জানো না কী চমৎকার!
বলিল মৃত্তের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর যে-বলদ তার জুড়িকে চেখেছে ঘানিগাছে।

দোয়েল

একটি নীরব লোক মাঠের উপর দিয়ে চুপে
ঈষৎ স্থবিরভাবে হাঁটে ।
লাঙল ও বলদের একগাল স্থির ছায়া খেয়ে
তাহার হেমন্তকাল দুই পায়ে ভর দিয়ে কাটে ।

নিজের জলের কাছে ভাগীরথী পরমাত্মীয় ।
চেয়েও পায় না তাকে কেউ তার সহিষ্ণু নিভৃতে ।
লাশকাটা ঘরের ছাদের 'পরে একটি দোয়েল
পৃথিবীর শেষ অপরাহ্ণের শীতে

শিশ তুলে বিভোর হয়েছে ।
কার লাশ ? কেটেছিলো কারা ?
সারা পৃথিবীতে আজ রক্ত ঝরে কেন ?
সে-সব কোরাসে একতারা ।

অপরাহ্ণের চাষা ভুল বুঝে হেঁটে যায় উচ্ছলিত রোদে ।
নেই, তবু প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে নারী ।
মর্গের মৃতদেহ দোয়েলের শিশে মিটে গেলে
আদিম দোয়েল এলে— অনুভব ক'রে নিতে পারি ।

সমুদ্র-পায়রা

কেমন ছড়ানো লম্বা ডানাগুলো সারাদিন সমুদ্র-পাখির।
যত দূর চোখ যায় সাগরের গাঢ় নীলিমায়
নিজেকে উজোতে গিয়ে চোখের নিমেষে
সকালবেলার রোদ পাখি হ'য়ে যায়।

কোথায় আফ্রিকা আলুলায়িত শ্বেতাঙ্গ-নীল চোখে—
এ-পৃথিবী কবলিত হয়,—
কোথায় চড়ুই দেখে বেরালের নির্জন চোখের
নীলিমা কি জীবন—কি মৃত্যুর বিস্ময়,—

অনুভব ক'রে প্রিয় মনে হয় জীবনই গভীর,—
মদির মৃত্যুর সাথে ঐতিহাসিক কাল খেলে ;
সৈকতে বাজারে মৃত পম্‌ফ্রেটের অমাযামিনীর
নক্ষত্রে সূর্যের মতো পাখি তুমি এলে।

আবহমান

পৃথিবী এখন ক্রমে হতেছে নিঝুম।
সকলেরই চোখ ক্রমে বিজড়িত হ'য়ে যেন আসে ;
যদিও আকাশ সিন্ধু ভ'রে গেলো অগ্নির উল্লাসে ;
যেমন যখন বিকেলবেলা কাটা হয় খেতের গোধুম
চিলের কান্নার মতো শব্দ ক'রে মেঠো ইঁদুরের ভিড় ফসলের ঘুম

গাঢ় ক'রে দিয়ে যায়।—এইবার কুয়াশায় যাত্রা সকলের।
সমুদ্রের রোল থেকে একটি আবেগ নিয়ে কেউ
নদীর তরঙ্গে—ক্রমে—তুষারের স্তূপে তার ঢেউ
একবার টের পাবে—দ্বিতীয় বারের
সময় আসার আগে নিজেকেই পাবে না সে টের।

এইখানে সময়কে যতদূর দেখা যায় চোখে
নির্জন খেতের দিকে চেয়ে দেখি দাঁড়ায়েছে অভিভূত চাষা ;
এখনো চালাতে আছে পৃথিবীর প্রথম তামাশা
সকল সময় পান ক'রে ফেলে জলের মতন এক ঢোঁকে ;
অঘ্রানের বিকেলের কমলা আলোকে
নিড়োনো খেতের কাজ ক'রে যায় ধীরে ;
একটি পাখির মতো ডিনামাইটের 'পরে ব'সে।
পৃথিবীর মহত্তর অভিজ্ঞতা নিজের মনের মুদ্রাদোষে
নষ্ট হ'য়ে খ'শে যায় চারিদিকে আমিষ তিমিরে ;
সোনালি সূর্যের সাথে মিশে গিয়ে মানুষটা আছে পিছু ফিরে।

ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে নগরী মলিন হ'য়ে আসে।
মানুষের উৎসাহের কাছ থেকে শুরু হ'লো মানুষের বৃত্তি আদায়
যদি কেউ কানাকড়ি দিতে পারে বুকের উপরে হাত রেখে
তবে সে প্রেতের মতো ভেসে গিয়ে সিংহদরজায়
আঘাত হানিতে গিয়ে মিশে যায় অন্ধকার বিম্বের মতন।

অভিভূত হ'য়ে আছে—চেয়ে ছাখো—বেদনার নিজের নিয়ম।

নেউলধূসর নদী আপনার কাজ বুঝে প্রবাহিত হয় ;
জলপাই-অরণ্যের ওই পারে পাহাড়ের মেধাবী নীলিমা ;
ওই দিকে সৃষ্টি যেন উষ্ণ স্থির প্রেমের বিষয় ;
প্রিয়ের হাতের মতো লেগে আছে ঘড়ির সময় ভুলে গিয়ে
আকাশের প্রসারিত হাতের ভিতরে।

সেই আদি অরণির যুগ থেকে শুরু ক'রে আজ
অনেক মনীষা, প্রেম, নিমীল ফসলরাশি ঘরে
এসে গেছে মানুষের বেদনা ও সংবেদনাময়।
পৃথিবীর রাজপথে—রক্তপথে—অন্ধকার অববাহিকায়
এখনো মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বার হয়।
তাহার পায়ের নিচে তৃণের নিকটে তৃণ মূক অপেক্ষায় ;
তাহার মাথার 'পরে সূর্য, স্বাতী, সরমার ভিড় ;
এদের নৃত্যের রোলে অবহিত হ'য়ে থেকে ক্রমে একদিন
কবে তার ক্ষুদ্র হেমন্তের বেলা হবে নিসর্গের চেয়েও প্রবীণ ?

চেয়েছে মাটির দিকে—ভূগর্ভে তেলের দিকে
সমস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অবিরল যারা,
মাথার উপরে চেয়ে দেখেছে এবার ;
দুরবিনে কিমাকার সিংহের সাড়া
পাওয়া যায় শরতের নির্মেঘ রাতে।
বুকের উপরে হাত রেখে দেয় তারা।
যদিও গিয়েছে ঢের ক্যারাভান ম'রে,
মশালের কেরোসিনে মানুষেরা অনেক পাহারা
দিয়ে গেছে তেল, সোনা, কয়লা ও রমণীকে চেয়ে ;
চিরদিন এই সব হৃদয় ও রুধিরের ধারা।
মাটিও আশ্চর্য সত্য। ডান হাত অন্ধকারে ফেলে

নক্ষত্রও প্রামাণিক ; পরলোক রেখেছে সে জ্বেলে ;
অনৃত সে আমাদের মৃত্যুতে ছাড়া।

মোমের আলোয় আজ গ্রন্থের কাছে ব'সে—অথবা
ভোরের বেলা নদীর ভিতরে
আমরা যতটা দূর চ'লে যাই—চেয়ে দেখি আরো-কিছু আছে তারপরে।
অনির্দিষ্ট আকাশের পানে উড়ে হরিয়াল আমারও বিবরে
ছায়া ফ্যালে। ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে যারা উঠে যায় ধবল মিনারে,
কিংবা যারা ঘুমন্তের মতো জেগে পায়চারি করে সিংহদ্বারে,
অথবা যে-সব থাম সমীচীন মিস্ত্রির হাত থেকে উঠে গেছে বিদ্যুতের তারে,
তাহারা ছবির মতো পরিতৃপ্ত বিবেকের রেখায় রয়েছে অনিমেষ।
হয়তো অনেক এগিয়ে তারা দেখে গেছে মানুষের পরম আয়ুর পারে শেষ
জলের রঙের মতো স্বচ্ছ রোদে একটিও বোলতার নেই অবলেশ।

তাই তারা লোষ্ট্রের মতন স্তব্ধ। আমাদেরও জীবনের লিপ্ত অভিধানে
বর্জাইস অক্ষরে লেখা আছে অন্ধকার দলিলের মানে।
সৃষ্টির ভিতরে তবু কিছুই সুদীর্ঘতম নয়—এই জ্ঞানে
লোকসানি বাজারের বাক্সের আতাফল মারীগুটিকার মতো পেকে
নিজের বীজের তরে জোর ক'রে সূর্যকে নিয়ে আসে ডেকে।
অকৃত্রিম নীল আলো খেলা করে ঢের আগে মৃত প্রেমিকের শব থেকে :

একটি আলোক নিয়ে ব'সে-থাকা চিরদিন ;
নদীর জলের মতো স্বচ্ছ এক প্রত্যাশাকে নিয়ে ;
সে-সবের দিন শেষ হ'য়ে গেছে
এখন সৃষ্টির মনে—অথবা মনীষীদের প্রাণের ভিতরে।
সৃষ্টি আমাদের শত শতাব্দীর সাথে ওঠে বেড়ে।
একদিন ছিলো যাহা অরণ্যের রোদে—বালুচরে,
সে আজ নিজেকে চেনে মানুষের হৃদয়ের প্রতিভাকে নেড়ে।
আমরা জটিল ঢের হ'য়ে গেছি—বহু দিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে।
যদি কেউ বলে এসে : 'এই সেই নারী,

একে তুমি চেয়েছিলে ; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ—'
তবুও দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ ?

আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর,
যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিলো ইতিহাসে ;
বিস্তৃত প্রাসাদে তারা দেয়ালের অব্‌লগু ছবি ;
নানা রূপ ক্ষতি ক্ষয়ে নানা দিকে ম'রে গেছি—মনে পড়ে বটে
এই সব ছবি দেখে ; বন্দীর মতন তবু নিস্তব্ধ পটে
নেই কোনো দেবদত্ত, উদয়ন, চিত্রসেনী স্থাণু ।
এক দরজায় ঢুকে বহিষ্কৃত হ'য়ে গেছে অন্য-এক দুয়ারের দিকে
অমেয় আলোয় হেঁটে তারা সব ।
(আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন বাতাসের শব্দ শুনেছিলো ;
তারপর হয়েছিলো পাথরের মতন নীরব ?)
আমাদের মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি
কাচের গেলাশে জলে উজ্জ্বল শফরী ;
সমুদ্রের দিবারৌদ্রে আরক্তিম হাঙরের মতো ;
তারপর অন্য গ্রহ নক্ষত্রেরা আমাদের ঘড়ির ভিতরে
যা হয়েছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে—সব এক সাথে প্রচারিত করে
সৃষ্টির নাড়ির 'পরে হাত রেখে টের-পাওয়া যায়
অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে র'য়ে গেছে অমোঘ আমোদ ;
তবু তারা করে নাকো পরম্পরের ঋণশোধ ।

জর্নাল : ১৩৪৬

আজকে অনেক দিন পরে আমি বিকেলবেলায়
তোমাকে পেলাম কাছে ;
শেষ রোদ এখন মাঠের কোলে খেলা করে—নেভে ;
এখন অব্যক্ত ঘুমে ভ'রে যায় কাচপোকা মাছির হৃদয় ;
নদীর পাড়ের ভিজে মাটি চুপে ক্ষয়
হ'য়ে যায় অক্লান্ত ঢেউয়ের বুকে ;

ঘাসে ঘুমে শান্ত হ'য়ে আসে ঘুঘু শালিকের গতি ;
নিবিড় ছায়ার বুকে ক্রমে-ক্রমে পায় অব্যাহতি
মাঠের সমস্ত রেখা ;
ঝাউফল ঝরে ঘাসে—সান্ত্বনার মতো এসে বাতাসের হাত
অশ্বত্থের বুক থেকে নিভিয়ে ফেলছে খাড়া সূর্যের আঘাত ;
এখুনি সে স'রে যাবে পশ্চিমের মেঘে।

গোরুর গাড়িটি কার খড়ের সুসমাচার বুকে
লাল বটফলে থ্যাঁতা মেঠোপথে জারুল ছায়ার নিচে নদীর সম্মুখে
কতক্ষণ থেমে আছে ;—চেয়ে দ্যাখো নদীতে পড়েছে তার ছায়া ;
নিঃশব্দ মেঘের পাশে সমস্ত বিকেল ধ'রে সে-ও যেন মেঘ এক, আহা,
শান্ত জলে জুড়োচ্ছে ;

এই সব নিস্তব্ধতা শান্তির ভিতর
তোমাকে পেয়েছি আজ এত দিন পরে এই পৃথিবীর 'পর।
দুজনে হাঁটছি ভরা প্রান্তরের কোল থেকে আরো-দূর প্রান্তরের ঘাসে :
উশখুশ খোপা থেকে পায়ের নখটি আজ বিকেলের উৎসাহী বাতাসে
সচেতন হ'য়ে উঠে আবার নতুন ক'রে চিনে নিতে থাকে
এই ব্যাপ্ত পটভূমি ;—মহানিমে কোরালির ডাকে
হঠাৎ বুকের কাছে সব খুঁজে পেয়ে।
'তোমার পায়ের শব্দ,' বললে সে, 'যেদিন শুনিনি

মনে হ'তো ব্রহ্মাণ্ডের পরিশ্রম ধুলোর কণার কাছে তবু
কিছু ঋণী ; ঋণী নয় ?
সময় তা বুঝে নেবে···
সেই সব বাসনার দিনগুলো ; ঘাস রোদ শিশিরের কণা
তারাও জাগিয়ে গেছে আমাদের শরীরের ভিতরে কামনা
সেই দিন ;
মা-মরা শিশুর মতো আকাঙ্ক্ষার মুখখানা কী যে :
ক্লান্তি আনে, ব্যথা আনে, তবুও বিরল কিছু নিয়ে আসে নিজে ।'

স্পষ্ট চোখ তুলে সে সন্ধ্যার দিকে : 'কত দিন অপেক্ষার পরে
আকাশের থেকে আজ শান্তি ঝরে—অবসাদ নেই আর শূন্যের ভিতরে ।'

রাত্রি হ'য়ে গেলে তার উৎসারিত অন্ধকার জলের মতন
কী-এক শান্তির মতো স্নিগ্ধ হ'য়ে আছে এই মহিলার মন ।
হেঁটে চলি তার পাশে, আমিও বলি না কিছু, কিছুই বলে না ;
প্রেম ও উদ্বেগ ছাড়া অন্য-এক স্থির আলোচনা
তার মনে ;—আমরা অনেক দূর চ'লে গেছি প্রান্তরের ঘাসে,
দ্রোণ ফুল লেগে আছে মেরুন শাড়িতে তার—নিম-আমলকীপাতা
হালকা বাতাসে
চুলের ওপরে উড়ে-উড়ে পড়ে—মুখে চোখে শরীরের সর্বস্বতা ভ'রে,
কঠিন এ-সামাজিক মেয়েটিকে দ্বিতীয় প্রকৃতি মনে ক'রে ।

অন্ধকার থেকে খুঁজে কখন আমার হাত একবার কোলে তুলে নিয়ে
গালে রেখে দিলো তার : 'রোগা হ'য়ে গেছো এত—চাপা প'ড়ে
গেছো যে হারিয়ে
পৃথিবীর ভিড়ে তুমি—' ব'লে সে খিন্ন হাত ছেড়ে দিলো ধীরে ;
শান্ত মুখে—সময়ের মুখপাত্রীর মতো সেই অপূর্ব শরীরে
নদী নেই—হৃদয়ে কামনা ব্যথা শেষ হ'য়ে গেছে কবে তার ;
নক্ষত্রেরা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর ।

পৃথিবীলোক

দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে ;
গ্রামপতনের শব্দ হয় ;
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা ব'লে মনে হয়।

এ-সব শূন্যতা ছাড়া কোনো দিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।
তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানি ভুল চিন্তা সংকল্পের
অবিরল মরুভূমি ঘিরে
বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ
এ-পৃথিবী, এই প্রেম, জ্ঞান, আর হৃদয়ের এই নির্দেশ

পুনশ্চ

সিন্ধুসারস

আদি লেখন

দু-এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি
হে সিন্ধুসারস!
মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতিদূর তরঙ্গের জানালায় নামি
নাচিতেছ টারন্‌টেলা—রহস্যের; আমি এই সমুদ্রের পারে চুপে থামি
চেয়ে দেখি বরফের মতো শাদা ডানা দুটি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীর আনন্দ জানায়।

মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে-শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান
হে সিন্ধুসারস,
আবার ফুরায় রাত্রি, হতাশ্বাস;—আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে; আবার তোমার গান
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহ্বান!

জানো কি অনেক যুগ চ'লে গেছে? ম'রে গেছে অনেক নৃপতি?
হে সিন্ধুসারস,
অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জানো না কি? অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে,—হারায়েছি আনন্দের গতি
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,—এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান?

জানি না কি ওগো পাখি, শাদা পাখি, ওগো নীল মালাবার ফেনার সন্তান!
হে সিন্ধুসারস,
তুমি পিছে চাহো নাকো, তোমার অতীত নাই, স্মৃতি নাই,
বুকে নাই আকীর্ণ ধূসর

পাণ্ডুলিপি ; পৃথিবীর পাখিদের মতো নাই শীত রাতে
ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
যে-রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নাই তব ; নাই নিম্নভূমি—নাই আনন্দের অন্তরালে
প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

স্বপ্ন তুমি দ্যাখোনি তো,—পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
হে সিন্ধুসারস,
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক ;—সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার,—ম্লান চুল,—চোখ তার হিজল বনের মতো কালো ;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো

নিভে গেছে ;—তুমি স্বপ্ন দ্যাখো নাকো—যেখানে সোনার মধু ফুরায়েছে,
করে না বুনন
হে সিন্ধুসারস,
মাছি আর ; হলুদ পাতার গন্ধে ভ'রে ওঠে অবিচল শালিখের মন,
মেঘের দুপুর ভাসে—সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন
মেঘের দুপুরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে ;
সেখানে আকাশে কেউ নাই আর, নাই আর পৃথিবীর ঘাসে।

তুমি সেই নিস্তব্ধতা চেনো নাকো,—অথবা রক্তের পথে পৃথিবীর
ধূলির ভিতরে
হে সিন্ধুসারস,
জানো নাকো আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে ;
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে ;
গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের,—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন !

এই সব জানো নাকো প্রবালপঞ্জর ঘিরে ডানার উল্লাসে
হে সিন্ধুসারস,
রৌদ্রে ঝিলমিল করে শাদা ডানা শাদা ফেনা-শিশুদের পাশে
হেলিওট্রোপের মতো দুপুরের অসীম আকাশে !
ঝিকমিক করে রৌদ্রে বরফের মতো শাদা ডানা,
যদিও এ-পৃথিবীর স্বপ্ন চিন্তা সব তার অচেনা অজানা।

চঞ্চল শরের নীড়ে কবে তুমি—জন্ম তুমি নিয়েছিলে কবে
হে সিন্ধুসারস,
বিষণ্ণ পৃথিবী ছেড়ে দলে-দলে নেমেছিলে সবে
আরব সমুদ্রে, আর চীনের সাগরে,—দূর ভারতের সিন্ধুর উৎসবে
শীতার্ত এ-পৃথিবীর আমরণ চেষ্টা ক্লান্তি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমেছিলে কবে নীল সমুদ্রের নীড়ে !

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম অঘ্রান
হে সিন্ধুসারস,
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই ;—আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ,—বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,
তুমি তাহা কোনোদিন জানিবে না ; সমুদ্রের নীল জানালায়
আমারই শৈশব আজ আমারেই আনন্দ জানায়।

'আমার কবিতাকে, বা এ-কাব্যের কবিকে, নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে : কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার ; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী ; সম্পূর্ণ অবচেতনার, সুররিয়ালিস্ট। আরো নানা রকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো-কোনো কবিতা, বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায়, সম্বন্ধে খাটে ; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।'

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ গ্রন্থটির প্রারম্ভিকায়, নিজের কবিতা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। এ থেকে বোঝা যায় যে জীবনানন্দর অভিপ্রায় ছিলো তাঁর কবিতাকে একটি অখণ্ড ও অটুট অভিজ্ঞতা হিসেবে গ্রাহ্য করা হোক। স্বীকার্য, তাঁর সমগ্র কাব্যের মধ্যে যে ভিন্ন-ভিন্ন কতকগুলি অধ্যায় আছে, সে-কথাও এখানে উহ্য নেই; কিন্তু সেগুলি অধ্যায় মাত্রই : অর্থাৎ বিপুলজটিল একটি অভিজ্ঞতার টুকরো—সব টুকরোগুলোকে একসঙ্গেগ্রহণ করলে পরেই তাঁর কাব্য সম্বন্ধে আমাদের সত্যিকার কোনো ধারণা করা সম্ভব হবে।

তাঁর গ্রন্থপঞ্জির দিকে তাকালেই এ-কথা সবচেয়ে স্পষ্ট হয় : বিশেষত 'বনলতা সেন' (কবিতাভবন ও সিগনেট প্রেস সংস্করণ), 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'—এই বইগুলো একই সঙ্গে আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। 'বনলতা সেন'-এর রচনাকাল ১৩৩২ থেকে ১৩৪৬ ; 'মহা-পৃথিবী'-র, ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮ ; 'সাতটি তারার তিমির'-এর ১৩৩৫ থেকে ১৩৫০। এ ছাড়াও তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (বৈশাখ ১৩৬১) গ্রন্থে 'বনলতা সেন' ও 'মহাপৃথিবী'র মধ্যবর্তী সময়ে রচিত তিনটি কবিতা এবং 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের মধ্যবর্তী অংশে লিখিত ছ-টি কবিতা প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়েছে—'শ্রেষ্ঠ কবিতা' ছাড়া অন্য-কোনো বইতে তারা স্থান পায়নি। ('শ্রেষ্ঠ কবিতা'র কবিতাগুলির 'বিন্যাস-সাধনে মোটামুটিভাবে রচনার কালক্রম অনুসরণ করা হয়েছে'—এ-কথা বিশেষ-ভাবে উল্লিখিত হয়েছে।)

তা ছাড়াও ওই সময়ে রচিত তাঁর বহু কবিতাই সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে—নিশ্চয়ই যখন তাঁর সমগ্র কাব্যসংকলন প্রয়োজিত হবে, তখন তা সংগৃহীত ও সংকলিত হবে। কেননা তাঁর মরণোত্তর গ্রন্থ 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় (১৯৫০) উল্লেখ করা হয়েছে যে সংকলিত কবিতাগুলির রচনা-কাল ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০ ; আরো উল্লেখ আছে : 'গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার জন্য কবি নিজেই কবিতাগুলি বাছাই করেছিলেন। কবিতাগ্রন্থের নামটি কবি-কর্তৃক মনোনীত।' বোঝা যায়, মোটামুটি একই সময়ে লেখা কবিতাগুলো জীবনানন্দ ভিন্ন-ভিন্ন গ্রন্থে

সঞ্চয় করতে চাচ্ছিলেন—হয়তো সেগুলো একসঙ্গে সংগ্রথিত হলে তাঁর কবিতা সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেতো।

তার একটি নজির 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। প্রথম যখন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (অগ্রহায়ণ ১৩৪৩) প্রকাশিত হয়েছিলো, তখন ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন: 'এই বইয়ের সব কবিতাই ১৩৩২ থেকে ১৩৩৬ সালের মধ্যে রচিত হয়েছে।···সেই সময়কার অনেক অপ্রকাশিত কবিতাও আমার কাছে রয়েছে—যদিও "ধূসর পাণ্ডুলিপি"র অনেক কবিতার চেয়েই তাদের দাবি একটুও কম নয়—তবুও সম্প্রতি আমার কাছে তারা ধূসরতর হয়ে বেঁচে রইলো।' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সিগনেট প্রেস সংস্করণে (ফাল্গুন ১৩৬৩) সেই 'ধূসরতর' কবিতাগুলো সংযোজিত হয়ে জীবনানন্দর পাঠকদের পক্ষে তৃপ্তির কারণ হয়েছিলো।

কিন্তু যাঁদের গ্রন্থসংগ্রহের উৎসাহ অভ্যাস ও উদ্যম আছে—এবং যাঁরা জীবনানন্দর অনুরাগী—তাঁদের সকলের কাছেই 'বনলতা সেন'-এর দুটি ভিন্ন সংস্করণ ও 'মহাপৃথিবী'র প্রথম সংস্করণটির কবিতাসূচি কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর ঠেকতে পারে। 'বনলতা সেন' প্রথম বেরোয় (পৌষ ১৩৪৯) কবিতাভবন থেকে, 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভূত হয়ে; ডিমাই আটপাতার আকারের ষোলো পৃষ্ঠার সেই বইটিতে কবিতা ছিলো মোট বারোটি। 'মহাপৃথিবী' বেরোয় (১৩৫১) পূর্বাশা লিমিটেড থেকে, আকার রয়্যাল আটপাতা, ৮+৪০ পৃষ্ঠার মধ্যে সবশুদ্ধ কবিতা ছিলো পঁয়ত্রিশটি: তার মধ্যে কবিতাভবন-প্রকাশিত 'বনলতা সেন' গ্রন্থের সব ক-টি কবিতাই সংগ্রথিত হয়েছিলো। পরে যখন (শ্রাবণ ১৩৫৯) সিগনেট প্রেস-এর বর্তমানে প্রচলিত 'বনলতা সেন' বেরুলো তখন তাতে আদি 'বনলতা সেন'-এর সব ক-টি কবিতাই এবং 'মহাপৃথিবী'তে প্রথম-গ্রন্থিত দুটি কবিতা মুদ্রিত হলো—এতদ্ব্যতীত যুক্ত হলো আরো ষোলোটি কবিতা। এদিকে 'মহাপৃথিবী' থেকে চোদ্দটি কবিতা সরিয়ে নেবার ফলে সেই বইটি অত্যন্ত কৃশকায় হয়ে উঠলো—অথচ দেখা গেলো যে ১৩৩৬-১৩৪৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে রচিত, অথচ গ্রন্থভুক্ত হয়নি, এমন বহু কবিতাই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে এলোমেলোভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

যতদিন-না তাঁর সমগ্র কাব্যসংগ্রহ বেরুচ্ছে, ততদিন সেই কবিতাগুলো কেবলমাত্র 'অজর অক্ষর/অধ্যাপক'-গবেষকের 'মাংস কৃমি খোঁটবার' উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে থাকুক, তা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। সেইজন্যই আমরা ১৩৪২ থেকে ১৩৫১ বঙ্গাব্দের মধ্যে (স্মরণীয়: 'মহাপৃথিবী'র প্রকাশকাল ১৩৫১) প্রকাশিত কবিতা থেকে অন্তত কিছু কবিতা সংগ্রহ করার চেষ্টা করি। এর পিছনে আমাদের বিনীত অভিপ্রায় ছিলো এই যে 'মহাপৃথিবী' থেকে যে চোদ্দটি কবিতা অন্যত্র সরানো হয়েছে, অন্তত সেই সংখ্যক নূতন কবিতা যোগ করে তাকে প্রায় একটি পূর্ববৎ আকার দেয়া। জীবনানন্দর অনেক স্মরণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক কবিতা

লুপ্ত হয়ে যাবার আগেই, অন্তত তার অনুরাগীদের কাছে তুলে ধরতে চাচ্ছিলুম। ১৩৩২ থেকে অন্তত ১৩৫০ পর্যন্ত জীবনানন্দ যে প্রায়-কোনো 'অধিকৃত' কবির মতো কবিতা লিখছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর উপমা ও কাব্যভাষা তাঁরই দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ; তাঁর চিন্তা ও ইন্দ্রিয়ময়তার তীব্র ও 'স্বতন্ত্র সারবত্তা' স্বতই প্রকাশিত। সেই জন্যেই, প্রায় পঁচিশ বছর পরে, এখন, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার সময়, তাঁর লেখা তৎকালীন অন্য কবিতা থেকে কয়েকটি এই 'মহাপৃথিবী'তে গ্রথিত হলো।

জীবনানন্দরই একটি কবিতার নাম ব্যবহার ক'রে বর্তমান সম্পাদক এই সংযোজিত কবিতাগুলি নির্বাচন করেছেন : 'মহাপৃথিবী' যে-রকম ঘৃনা, বিদ্রূপ ও তিক্ত মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত, এই কবিতাগুলির স্থায়ী ভাব তা-ই ব'লেই আমাদের বিশ্বাস। তবু যাতে এই নতুন-গ্রথিত কবিতাগুলো আলাদা ক'রে সনাক্ত করা যায়, সেইজন্যেই 'আমিষাশী তরবার' নাম দিয়ে তাদের পৃথক করা হলো। এই অংশের শেষ তিনটি কবিতা ওই সময়ে রচিত হলেও 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' ভিন্ন অন্য-কোনো গ্রন্থে প্রাপ্য নয় ; জীবনানন্দর প্রজ্ঞা, ইন্দ্রিয় ও জল্পনার কাছে এই বিপুলাপৃথুলা 'মহাপৃথিবী' যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিলো আমাদের মনে হলো "পৃথিবীলোক" কবিতাটি তার তুমুল অভিঘাত দ্বারা গ্রন্থটির যোগ্য সমাপ্তি বলে গণ্য হতে পারে।

এখানে এ-কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জীবনানন্দ তাঁর কবিতা বার-বার পরিশোধন ও পরিমার্জন করতেন ; তাঁর রচনার এই উদাসীন ও ঢিলেঢালা ভঙ্গি বস্তুত ছিলো তার 'ভয়ংকর ও অধিকৃত' প্রজ্ঞা, পরাদৃষ্টি ও উপমা দ্বারা সচেতনভাবে নির্মিত—বিশ্বজোড়া 'নিরালম্ব অসংগতি'কে কল্পনা-মনীষার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আঘাত করার পদ্ধতি হিসেবেই তিনি এই আপাতশৈথিল্যের চর্চা করতেন। 'আমিষাশী তরবার' অংশের শেষ তিনটি কবিতা ছাড়া (কেননা সে-তিনটি কবিতা তাঁর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি গ্রন্থিত করার অনুমোদন দিয়েছিলেন) বাকি কবিতাগুলো তিনি নিশ্চয়ই নিরন্তর সংশোধন ও পরিমার্জনা করতেন। তাঁর বহু কবিতারই তৎকর্তৃক অনুমোদিত প্রচলিত পাঠ আদি লেখন থেকে ভিন্ন। 'মহাপৃথিবী'তে "সিন্ধুসারস" কবিতাটির যে-লেখন মুদ্রিত হয়েছিলো তার সঙ্গে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় সংকলিত "সিন্ধুসারস" কবিতার পাঠ মেলে না। যেহেতু 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' 'মহাপৃথিবী'র দশ বছর পরে প্রয়োজিত হয়েছিলো, সেই জন্য আমরা শেষ-প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠকেই প্রমাণিত ব'লে ধ'রে নিয়েছি—কিন্তু পূর্বতন পাঠ সম্বন্ধেও পাঠকের কৌতূহল ও ঔৎসুক্য অবিরল হবে ভেবেই আদি লেখনটিকেও এই পুনশ্চ অংশে সংকলিত করা হলো। "শব" কবিতাটিও 'মহাপৃথিবী'তে একটু অন্যভাবে ছাপা হয়েছিলো—প্রতি দুই চরণ অন্তর তিনি সামান্য ফাঁক দিয়েছিলেন ;

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় কবিতাটি সেই মধ্যবর্তী নিরঞ্জন অংশগুলি বাদ দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে। আমরা যে শেষোক্ত গ্রন্থের মুদ্রিত রূপটিকেই গ্রহণ করেছি, সেটা এখানে উল্লেখ করা জরুরি মনে করি।

বাংলায় একই শব্দের ভিন্ন-ভিন্ন বানান যে-কোনো লেখক ও পাঠককে অস্থির ক'রে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। তবে জীবনানন্দ যে ক্রমেই আধুনিক বাংলা বানানের দিকে ঝুঁকছিলেন, তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ গ্রন্থদুটি ('বনলতা সেন'/সিগনেট প্রেস সংস্করণ ও 'শ্রেষ্ঠ কবিতা') তার সাক্ষী। সেই কথা মনে রেখেই এই বইয়ের বানানের মধ্যে আমরা সম্মিতি আনার চেষ্টা করেছি : তা ছাড়া 'মহাপৃথিবী'র আদি সংস্করণে (১৩৫১) মুদ্রণঘটিত নানা প্রমাদও হয়তো বানানের নৈরাজ্য ঘটাতে সহায়তা করেছিলো।

একেবারে 'ঝরা পালক' (১৩৩৪)-এর সময় থেকে—অর্থাৎ ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি' পত্রিকার সম্পাদনাকাল থেকেই—শ্রীবুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রতিটি ভঙ্গি অভ্যাস ও বিবর্তনের সঙ্গে পরিচিত। জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রথম প্রচার-কালে তাঁর উৎসাহ ও উদ্যম ছিলো অপরিসীম; এখনও, জীবনানন্দর মৃত্যুর প্রায় পনেরো বছর পরে, জীবনানন্দর দুষ্প্রাপ্য ও বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি সংগ্রহ করার সময় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দুর্লভ সংগ্রহকে অবারিতভাবে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। এই বইয়ের 'আমিষাশী তরবার' অংশ তাঁর সাহায্য ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হতো না।

বনলতা সেন—যদি কোনো একটিমাত্র গ্রন্থে জীবনানন্দ দাস তাঁর সার্থকতম পরিচয় রেখে গিয়ে থাকেন—সে গ্রন্থ **বনলতা সেন**। তাঁর কাব্যের প্রধান গুণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চিত্ররূপময়।' 'প্রসন্ন বেদনায় কোমল উজ্জ্বল বড়োই নতুন এবং নিজস্ব তাঁর লেখা : বাংলা কাব্যের কোথাও তার তুলনা পাই না।' এই বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী। পঞ্চদশ সংস্করণ। দাম ৪.০০

ধূসর পাণ্ডুলিপি—বিশবছর আগে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় জীবনানন্দ দাস লিখেছিলেন—'সেই সময়ের অনেক অপ্রকাশিত কবিতা আমার কাছে রয়েছে; যদিও ধূসর পাণ্ডুলিপির অনেক কবিতার চেয়েই তাদের দাবি একটুও কম নয়, তবুও সম্প্রতি আমার কাছে তারা ধূসরতর হয়ে বেঁচে রইল।' বর্তমান সংস্করণে সংযোজিত সেই সব ধূসরতর কবিতায় সদ্যোজাত অথচ চিরন্তন অপূর্বতা পাঠককে মুগ্ধ করবে। ষষ্ঠ সংস্করণ। দাম ৬.০০

রূপসী বাংলা—বাংলার রূপ তার প্রকৃতিতে, কাব্যকাহিনী এবং ইতিহাসের ঘটনায় বিধৃত হয়ে আছে। এর মধ্যে বিশেষত প্রকৃতির অংশ নিয়ে আপাততুচ্ছকে ঘিরে যে মহিমামণ্ডল জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা যে কোনো দেশের সাহিত্যেই বিরল। **রূপসী বাংলা** তাঁর চিত্রময়রূপ কাব্যরীতির মধ্যেও স্বল্পপরিজ্ঞাত একটি নতুন অধ্যায়, কেননা এর প্রতিটি কবিতা এক-একটি সনেট। এই কবিতাবলীতে, মৃত্যুর-ছায়া-পড়া সকরুণ গভীর একটি ভালোবাসার কাহিনী তিনি রচনা করে গেছেন। একাদশ সংস্করণ। দাম ৪.৫০

কবিতার কথা—জীবনানন্দ দাশ কবিতা ছাড়া, কবিতা বিষয়ে কতিপয় মূল্যবান প্রবন্ধও লিখেছিলেন। এই সব প্রবন্ধের মধ্যে কাব্য বিষয়ে তাঁর জ্ঞান, বোধ, অভিনিবেশ এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়, তাঁর কাব্যের মতোই একান্ত নিজস্ব এক ভাষায় বিধৃত হয়ে আছে। চতুর্থ সংস্করণ। দাম ১০.০০